প্রকল্প প্রতিবেদন

প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ভিত্তিক কৃষি-প্রতিবেশ শিক্ষণ ও গণগবেষণা (২০১৭-২০১৮)

কৃষি-প্রতিবেশ গণগবেষণা দল



ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

প্রকল্প প্রতিবেদন

প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ভিত্তিক কৃষি–প্রতিবেশ শিক্ষণ ও গণগবেষণা (২০১৭-২০১৮)

কৃষি-প্রতিবেশ গণগবেষণা দল



RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

প্রকল্প প্রতিবেদন
প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ভিত্তিক কৃষি–প্রতিবেশঃ
শিক্ষণ ও গণগবেষণা (২০১৭-২০১৮)

Project Report
Agroecology from Below : Pedagogyad Participatory Action (2017-2018)

কৃষি-প্রতিবেশ গণগবেষণা দল

Action Research group on Agroecology

প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর, ২০১৮

Published in: December, 2018

প্রকাশনায়ঃ
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
বাসা ০৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোনঃ (+৮৮০-২) ৯৮২০০৫১-২
Email: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

Published by:
Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
House 7 (Kajoli), Road 17, Block C
Banani, Dhaka- 1213, Bangladesh
Phone: (+880-2) 9820051-2
E-mail: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

সহায়তায়ঃ
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং
ফ্রাঞ্জ-মেহ্রিং-প্লাটজ্ ১
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী
Website: www.rosalux.in
www.rosalux-southasia.org

Supported by:
Rosa Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin, Germany
Website: www.rosalux.in
www.rosalux-southasia.org

মুদ্রণেঃ
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১৩

Printed by:
Dana Printers Limited
Ga-16 Mohakhali C/A, Dhaka-1213

প্রচ্ছদঃ
.....
.....

Cover:
.....
.....

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung e.V with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany

উৎসর্গ

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ-এর পরিচালক
প্রয়াত ড. মোঃ কোরবান আলী

মুখবন্ধ

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গতানুগতিকতার বাইরে প্রাগ্রসর চিন্তা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। যার মধ্যে শিক্ষা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন ব্যবস্থা ও তার মানোন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ, দারিদ্র দূরীকরণ (মানবিক ও আর্থিক) এবং কৃষি অন্যতম। কৃষি আমাদের দেশের ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক বলয়কে কেন্দ্র করে মানবজীবন যাপনের অন্যতম ক্ষেত্র। সর্বোপরি কৃষির সাথে দেশজ এবং বৈশ্বিক রাজনীতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। জ্ঞানতত্ত্বে কৃষি তাই যেমন গুরুত্বপূর্ণ, রিইব-এর কাজের পরিসরেও তেমনি কৃষি বিষয়ক গবেষণা অনন্য মর্যাদায় আসীন। আমাদের কাজে গবেষণার বিষয় হিসেবে কৃষির অন্তর্ভূক্তিকরণে রিইব এর প্রয়াত পরিচালক ড. কোরবান আলী-র ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

রিইব বাংলাদেশের কৃষি নিয়ে সারা দেশব্যাপী কৃষকদের সাথে বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছে। তার মধ্যে কৃষি প্রশ্ন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি ব্যবহার এবং বর্তমানে "প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি-প্রতিবেশ: শিক্ষণ ও গণগবেষণা (২০১৭-১৮)" নামে একটি কর্ম-গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই কাজের আওতায় নীলফামারী, বগুড়া, সাতক্ষীরা ও ঢাকায় কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ, জনস্বাস্থ্য, মাটি-পানি-জীবন তথা জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিয়ে আলোচনা-পরামর্শ ও দক্ষতা-বৃদ্ধিমূলক কর্মশালার ব্যবস্থা এবং জ্ঞান চর্চা করা হয়।

এই প্রতিবেদনে গত দুইবছর ধরে কৃষি, কৃষক ও কৃষি-প্রতিবেশ নিয়ে যে প্রক্রিয়ায় এবং যেসকল কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়েছে তার সচিত্র সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং অর্জনকেও বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমরা প্রকল্পের কাজে ক্রমাগতভাবে অগ্রসরমানতা এবং দক্ষতা বর্ধন লক্ষ্য করছি, যা আশাপ্রদ।

বাংলাদেশে সামগ্রিক পরিসরে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ। তাই তত্ত্ব ও প্রয়োগে কৃষিকে যথাযথভাবে অনুধাবন করে প্রয়োগ করা আমাদের কাজের উদ্দেশ্য। এই কাজে রিইব ভবিষ্যতে আরও ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের এই কাজে রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর সহযোগিতা আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে।

ড. শামসুল বারি
চেয়ারম্যান, রিইব।

সূচিপত্র

ভূমিকা	৭
উদ্দেশ্য	৮
টার্গেট গ্রুপ	৮
প্রকল্প এলাকা	৯
গবেষণা পদ্ধতি	৯
কার্যক্রমসমূহ	৯
১. গণগবেষণা দল গঠন	৯
২. গণগবেষণা প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১০
৩. গণগবেষণা মিটিং	১০
ক. সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং কর্মপন্থা নির্ধারণ	১১
খ. কৃষকের সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতা তৈরি	১১
গ. স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ নিয়ে আলোচনা	১১
ঘ. জ্ঞান নির্ভর আলোচনার প্রসার	১২
ঙ. পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন	১২
চ. কৃষক সংগঠন	১২
৪. জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ কর্মশালা	১৩
৫. কৃষি শিক্ষণ কর্মশালা (আবাসিক কেন্দ্রীয়ভাবে)	১৫
৬. কৃষি শিক্ষণ কর্মশালা (স্থানীয় পর্যায়ে)	১৮
৭. এক্সচেঞ্জ ভিজিট	১৮
৮. স্থানীয় পর্যায়ে সংলাপ বা ডায়ালগ আয়োজন	১৮
৯. কনসালটেশন মিটিং	২০
১০. জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি বিষয়ে গোলটেবিল সংলাপ বা ডায়ালগ আয়োজন	২২
১১. নারী কৃষকদের অবস্থান বিষয়ে একশন রিসার্চ	২৩
১২. নির্বাচনী প্রার্থীদের কৃষি ভাবনা বিষয়ে গবেষণা	২৩
১৩. শিক্ষামূলক প্রকাশনা	২৩
১৩.১. বীজবৈচিত্র্য ও এর রাজনৈতিক অর্থনীতি	২৩
১৩.২. নারী ও কৃষি-প্রতিবেশ	২৪
১৩.৩. জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও কৃষি	২৪
১৩.৪. কৃষি প্রতিবেশ: ঐতিহ্য, বর্তমান ও ভবিষ্যত	২৪
১৪. জাতীয় সেমিনার	২৫
উপসংহার	২৬
সংযুক্তি-১	৩৩
সংযুক্তি-২	৩৮
সংযুক্তি-৩	৪৫
সংযুক্তি-৪	৫৪
সংযুক্তি-৫	৫৮

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং বিপুল শ্রমশক্তি ধারণ করার ক্ষেত্র। সেই সাথে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সনাতনী কৃষির বদলে বর্তমানের কৃষিতে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষিকে করেছে গতিময়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বিভিন্ন ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন, কৃষি গবেষণা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার প্রকল্প এবং কৃষকের নিরলস পরিশ্রম প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশ এ সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু বালাইনাশক, কৃষি তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সিনথেটিক বা রাসায়নিক সার, সেচের পানির যথেচ্ছ ব্যবহারে আজকের আধুনিক কৃষি আবার হুমকির মুখেও পড়েছে। বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতে এখনকার কৃষিকাজগুলো বেশিরভাগই নির্মল পরিবেশের জন্য সহায়ক নয় (কৃষি ডাইরি ২০১৪: ৬৫, কৃষি মন্ত্রণালয়)। যেসব বালাইনাশক ও সার কৃষিতে ব্যবহার করা হয় তার অধিকাংশই রাসায়নিক। রাসায়নিক দ্রব্যাদির নির্বিচার ও যথেচ্ছ ব্যবহারে জলজ ও ক্ষেতে থাকা উপকারী প্রাণীগুলো অহরহ মারা যাচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গিয়ে কৃষকরা পরিবেশ- প্রতিবেশের দিকে নজর দিচ্ছেন না এবং পরিবেশবান্ধব চাষ পদ্ধতিগুলো ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সবাই ইকোসিস্টেম বা খাদ্য-শৃঙ্খলের কথা ভুলে গেছে। যেখানে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। একজন মারা পড়লে অন্যের খাদ্যের অভাব ঘটবে, হারিয়ে যাবে জীববৈচিত্র্য। পরিবেশ হবে বিপর্যস্ত। এছাড়া ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ না জেনে জমিতে দেয়ার ফলে বিভিন্ন ধাতুর বিষক্রিয়ায় মাটি অতি মূল্যবান উর্বরা শক্তি হারাচ্ছে। বাংলাদেশের মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। সব মিলিযে আমাদের কৃষি প্রতিবেশ ও পরিবেশ আজ হুমকির মুখে।

এছাড়া বালাইনাশকের যথেচ্ছ ও নিয়মবহির্ভূত ব্যবহারের ফলে উৎপাদিত ফসলের মধ্যেও বিষ থেকে যাচ্ছে, যা মানুষ প্রতিনিয়ত খাচ্ছে। এর ফলে মরণব্যাধি ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে দেশের আপামর জনগণ। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানি বীজ ও কৃষি উপকরণ ব্যবসায় প্রবেশ করেছে। ফলশ্রুতিতে একদিকে কৃষকরা যেমন বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের জন্য কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে ভেজাল ও প্রাপ্যতার সমস্যাও দেখা যাচ্ছে। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় ফসলের লাভজনক দাম পাওয়াও এখন কৃষকের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন ফসলের স্থানীয় জাত, নানান অপ্রধান শস্য, যেগুলো অধিক স্বাদ ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন, প্রতিবেশবান্ধব এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ সেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব দেশের ঝুঁকি বাড়বে তার মধ্যে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য। কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, অবকাঠামো এবং সর্বোপরি আমাদের জীবন জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় অবলম্বনের সব ক্ষেত্রেই জলবায়ুর সরাসরি প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এর ফলে শস্যের গুণাগুণ ও উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আসবে। স্বাদু পানির স্বল্পতা হবে, মাটির উর্বরতা

কমে যাবে, নতুন বালাই দেখা দিতে পারে, ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি ও শস্যের বৈচিত্র্য কমে যেতে পারে। তবে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলে এর ক্ষতিকর প্রভাবকে কম বেশী নিয়ন্ত্রণ বা পরিহার করা যেতে পারে। দূর্যোগের সময় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট দূর্যোগের ক্ষতি পরিহার করা যায় অথবা ক্ষতির হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায়। এ পরিস্থিতিতে যে ধরনের কৃষিতে মাটি, পানি, বায়ু দূষণ হবে না; কৃষক ও ক্রেতাদের স্বাস্থ্য, প্রতিবেশের সুরক্ষা হবে, পরিবেশের জীববৈচিত্র্যও হুমকির মুখে পড়বে না, এ ধরনের পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয় রোধ করে যেরকম কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন আগামী দিনের কৃষিকে সে আঙ্গিকে সাজাতে হবে। এজন্য জৈব সার ও বালাইনাশকের ব্যবহার, বীজ সংরক্ষণ, কৃষি জমি হ্রাস রোধকরণ, স্থানীয় জাতের পুষ্টি ও অন্যান্য গুণে সমৃদ্ধ বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ সম্প্রসারণ, কৃষি প্রতিবেশ অনুযায়ী চাষাবাদ, বনায়ন ও ফসল উৎপাদন- প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করে সব স্তরের জনগণকে এসব ব্যাপারে ব্যাপকভাবে সচেতন করতে হবে। বিভিন্ন ফসলের হারিয়ে যাওয়া বৈচিত্রতা ফিরিয়ে এনে পুষ্টি, স্বাদ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের প্রতিবেশ, জনস্বাস্থ্য, সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং দেশের কৃষির টেকসই উন্নয়নে জন্য কাজ করা এখন একান্ত প্রয়োজন। পাশাপাশি বিশাল সংখ্যক ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার দিকেও মনোযোগী হতে হবে।

'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমালা' (Millenium Development Goal) বাস্তবায়নে ব্যাপক সফলতা অর্জনের পর বাংলাদেশ 'সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমালা' (Sustainable Development Goal) বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর, যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলোকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় জৈব কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন, মাটির স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য উৎপাদনের জন্য 'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬' প্রণয়ন করেছে।

উপরোক্ত বাস্তবতার আলোকে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর সহায়তায় "প্রান্তিয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি-প্রতিবেশ: শিক্ষণ ও গণগবেষণা" শীর্ষক এই একশন রিসার্চ (action research) প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ সালে বাস্তবায়ন করেছে।

উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশে কৃষির উৎপাদনে বিভিন্ন প্রতিবেশগত এলাকায় বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে "কৃষি-প্রতিবেশ নীতি" (Agro-ecology) একশন রিসার্চের (গণগবেষণা) মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা;
- কৃষি-প্রতিবেশ নীতি গ্রহণে স্থানীয় বা লোকজ কৃষি চর্চা প্রসারিত করা;
- কৃষি-প্রতিবেশ এবং পরিবেশের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সাম্প্রতিক বৈশ্বিক ও স্থানীয় জ্ঞান সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করে তোলা;
- অনুধাবন, শিক্ষণ এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে রাজনীতিবিদ, নীতি নির্ধারক, কৃষিবিদ এবং নাগরিকদের মাঝে প্রচার ও প্রসার করা।

টার্গেট গ্রুপ:

কৃষক, রাজনীতিবিদ, গবেষক, শিক্ষাবিদ, কৃষি ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, নীতি-নির্ধারক, গণমাধ্যম কর্মী এবং কৃষি ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রকল্প এলাকা:

বাংলাদেশের চারটি কৃষি-প্রতিবেশ এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত গ্রামগুলো হলো:

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	
১	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	ফুলবাড়ী	নয়াপাড়া	বালুয়ারতাইর
২	নীলফামারী	নীলফামারী সদর	সোনারায়	বেড়াকুঠি	জয়চন্ডি
৩	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	ঈশ্বরীপুর	ধুমঘাট	বংশীপুর
৪	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	বারশট ও বারখাইন	গুন্দিপ	ঝিউরি
৫	ঢাকা	শহর	শহর		

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গণগবেষণা পদ্ধতি (Participatory Action Research) ব্যবহার করা হয়েছে। এ জন্য প্রকল্পভুক্ত ৪টি জেলার ৮টি গ্রামে ১৫ জন কৃষকের সমন্বয়ে ১টি করে গণগবেষণা দল গঠন করে গণগবেষণা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তিতে দলগুলো নিয়মিতভাবে গণগবেষণা মিটিং আয়োজন করে আলোচনার মাধ্যমে কৃষি-সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানে পদক্ষেপ (action) গ্রহণ করেছেন। এই পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তার লক্ষ্যে কৃষকদের জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি (Agro-ecology) ও পরিবেশ বিষয়ক ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া কৃষকদের অভিজ্ঞতা উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় অন্যান্য কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিবিদ ও নীতি-নির্ধারকদের সাথে শেয়ার করার জন্য আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বই প্রকাশ করে প্রচার করা হয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে জন্য ১ জন প্রকল্প সমন্বয়ক, ১ জন একাউন্টটেন্ট, ১ জন সমন্বয়কারী (ডকুমেন্টেশন ও ট্রেনিং), ১ জন মাঠ সমন্বয়কারী ও ৪ টি জেলায় ১ জন করে মোট ৪ জন গবেষণা সহকারি কাজ করেছেন।

কার্যক্রমসমূহ:

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. গণগবেষণা দল গঠন

২০১৭ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকল্পভুক্ত ৮টি গ্রামে ১৫ জন নারী ও পুরুষ কৃষকের সমন্বয়ে ৮টি গণগবেষণা দল গঠন করা হয়। দলের সদস্যবৃন্দ একেকজন গণগবেষক হিসেবে একক ও দলীয়ভাবে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছেন। এক্ষেত্রে গণগবেষণার উদ্দীপক বা এনিমেটর হিসেবে স্থানীয় গবেষণা সহকারি গণগবেষকদের সহায়তা করেছেন।

২. গণগবেষণা প্রশিক্ষণ কর্মশালাঃ

গণগবেষক কৃষক ও গবেষণা সহকারীদের গণগবেষণা তত্ত্ব বিষয়ক ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য ৪টি প্রকল্প এলাকায় (নীলফামারী, বগুড়া, সাতক্ষীরা ও চট্টগ্রামে) মোট ৪টি গণগবেষণা প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রতিটি কর্মশালায় ২টি গ্রামের ৩০ জন গণগবেষক কৃষক অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে এবং কৃষি বিষয়ক উদাহরণের মাধ্যমে কৃষকরা গণগবেষণা সম্পর্কে অবহিত হন। কর্মশালা শেষে সকল কৃষকই গণগবেষণা করতে আগ্রহী হন।

গণগবেষণা: গবেষণার একটি পদ্ধতি হিসেবে গণগবেষণা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অরল্যান্ডো ফালস বোর্দা ১৯৭০-এর দশকে গণগবেষণাকে (পার্টিসিপেটরী একশন রিসার্চ) উন্নয়নশীল দেশের জন্য তাত্ত্বিকভাবে চিন্তা ও অনুশীলন করেছেন। গণগবেষণার মূল ধারণাটি হল চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে কোন শ্রেণীই কোন শ্রেণীর চাইতে 'অগ্রসর' নয়। বাস্তবে যা ঘটে তা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের কারণে কারও চিন্তা করার অবকাশ বেশী কারও কম। কেউবা বেঁচে থাকার জন্য স্থানীয় ক্ষমতাবান শ্রেণীর কাছে চিন্তা সমর্পন করেন। এরকম সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা সাধারণ মানুষের চোখে 'বুদ্ধিবৃত্তিক' শ্রেণী বলে বিবেচিত হয়। ফলে, অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে শিক্ষিতদের মত চিন্তার ক্ষমতা তাদের নেই এবং তারা শিক্ষিত শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তবে, তার মানে এই নয় যে তাদের চিন্তার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে, বরং হয়তো সেটার ধার কমেছে মাত্র।

গণগবেষণা শব্দটির পেছনে আরও একটি নাম জড়িয়ে আছে, তিনি Paulo Freire। তিনি চিন্তা করেছিলেন যে মানুষ সমাজের বাস্তবতাকে বুঝতে পারবে আনুষ্ঠানিক জ্ঞান নয়, বরং সামষ্টিক ও নিজস্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তারা নিজেদের বাস্তবতায় তাদের নিজ উদ্যোগের দ্বারা নিজেরাই পরিবর্তন আনতে পারবে। এটি তাদেরকে নতুনতর উদ্যোগ নিতে উৎসাহ দেবে।

গণগবেষণার একটি প্রধান লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মরচে ধরা চিন্তাশক্তিকে আবার শাণিত করা যাতে তারা গভীর সমাজ বিশ্লেষণে নিয়োজিত হন। যাতে তারা নিজস্ব যৌথ সমাজ বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজেদের জীবনের অবস্থার উন্নতির যৌথ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন এবং এই প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা আবার যৌথ ভাবে বিশ্লেষণ করে নিজেদের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান উন্নত করেন এবং সেই উন্নত জ্ঞানের আলোকে আবার নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। এককথায় শ্রমজীবিদের নিজস্ব প্রাক্সিস চালু করাই এর মূল লক্ষ্য।

এভাবে আলোচনা করে নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সেই সমস্যা সমাধানে কর্মপন্থা নিধারণ, নির্ধারিত কর্মপন্থা অনুযায়ী একশন বাস্তবায়ন এবং সেই একশনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে পুনরায় কর্মপন্থা নির্ধারণ ও একশন বাস্তবায়ন করে গণগবেষণা করা হয়।

৩. গণগবেষণা মিটিং

গণগবেষণার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে গণগবেষণা মিটিং। নিয়মিত গণগবেষণা মিটিং-এর মাধ্যমে গণগবেষণা চলমান থাকে। ২০১৭ সালে ৮টি গণগবেষণা দলের কৃষকরা ১৫টি করে ১২০টি এবং ২০১৮ সালে ১৮টি করে ১৪৪টি মিটিং আয়োজন করেন। এই মিটিংগুলোর মাধ্যমে কৃষকরা নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। কর্মপন্থা অনুযায়ী একশন বাস্তবায়ন করে সেই অভিজ্ঞতা আবার পরবর্তী মিটিং-এ আলোচনা করা হতো। গণগবেষণা মিটিং-গুলোর প্রধান দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:



ছবি: গণগবেষণা মিটিং

ক. সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং কর্মপন্থা নির্ধারণ

প্রাথমিকভাবে কৃষকরা যেসব সমস্যা চিহ্নিত করেছিলেন সেগুলো হল: বীজের গুণগত মান ও প্রাপ্যতার সমস্যা, ভেজাল কৃষি উপকরণ, কৃষি শ্রমিকের সংকট, রাসায়নিক কৃষি উপকরণ ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাওয়া, জীববৈচিত্র্য মারা যাওয়া, শত্রু পোকার প্রাদুর্ভাব, জনস্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব, খাদ্যে রাসায়নিক বিষ, কৃষিকাজের খরচ অনেক বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও উৎপাদিত ফসল লাভজনক দামে বিক্রি না করতে পারা, লবণাক্ততা (সাতক্ষীরাতে) ইত্যাদি। কৃষকরা এসব সমস্যা সমাধানে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই প্রেক্ষিতে কৃষকরা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির পদ্ধতিগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন।

খ. কৃষকের সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতা তৈরি

গণগবেষণা মিটিং-এ পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য, কৃষক সমাজ, জলবায়ু পরিবর্তন, জাতীয় জৈব কৃষি নীতি প্রভৃতি নিয়ে খোলামেলা ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে এসব বিষয়ে সচেতনতা ও সংবেদনশীতা সৃষ্টি হয়েছিল, যার প্রতিফলন তাদের কার্যক্রমে দেখা যায়। কৃষকরা গ্রামের পাখি রক্ষার জন্য গাছে কলসী বেঁধে দেওয়া, পাখি শিকার বন্ধে কার্যক্রম গ্রহণ, প্রতিবেশ রক্ষায় স্থানীয় গাছ রোপণ, রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়ে আনা, স্থানীয় প্রজাতির বিভিন্ন ফসলের নানান জাত চাষ করা, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, মুড়ি-খই এর মত স্থানীয় খাদ্য তৈরি করা, স্থানীয় বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিময়, কৃষিক্ষেতে জীববৈচিত্র্য লালন করে উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কৃষি-ইকোসিস্টেমকে জটিল ও ঘাতসহ করে তোলা, স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নামের তালিকা তৈরি ও ব্যবহার অনুসন্ধান, জৈব সার তৈরি ও ব্যবহার, জৈব বালাইনাশক তৈরি ও ব্যবহার ইত্যাদি একশন যৌথ ও এককভাবে বাস্তবায়ন করেন।

গ. স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ নিয়ে আলোচনা

গণগবেষক কৃষকরা বর্তমান কৃষি ব্যবস্থার নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে আলোচনার সময়, কিভাবে এই কৃষি ব্যবস্থা আসলো তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। বর্তমানের কৃষির সাথে তাদের পূর্বপুরুষের কৃষি

ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তারা এখনকার পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যগত বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করেন রাসায়নিক কৃষি উপকরণ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহারকে। পরবর্তিতে তারা এর বিকল্প অনুন্ধান করেন।

ঘ. জ্ঞান নির্ভর আলোচনার প্রসার

গণগবেষক কৃষকরা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি করতে যেয়ে ইকোসিস্টেমের মত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক টার্ম এর সাথে পরিচিত হন এবং নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে এগুলোকে আত্মস্থ করেন। ইকোসিস্টেমের গাঠনিক জটিলতা, বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক, বিভিন্ন প্রাকৃতিক চক্র (পানি চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, কার্বন চক্র ইত্যাদি), বীজের জীবনচক্র, ধান বীজের বৈশিষ্ট্যকরণ (ক্যারেক্টারাইজেশন), জীবাণু সার, বালাই, আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান, কৃষি-ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও কৃষিতে তাদের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা ও ব্যবহারিক চর্চার মাধ্যমে কৃষকরা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় নিয়মিত ঘোরাফেরা করেছেন এবং তাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এছাড়া গ্রামের প্রবীন কৃষকদের বিশেষত নারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সময়কার সুস্থায়ী কৃষি পদ্ধতিগুলো এবং কৃষি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা জেনেছেন। এর পাশাপাশি স্থানীয় উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের অর্জিত জ্ঞান যাচাই করে নিয়েছেন।

ঙ. পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন

গণগবেষক কৃষকরা মৌসুম অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের মিশ্র ও পর্যায়ক্রমিক চাষ, বীজ সংগ্রহ ও বীজ সংরক্ষণ, জৈব ও জীবাণু সার তৈরি, জৈব বালাইনাশক তৈরি, শস্য ও অশস্যের প্রজাতি ও জাতবৈচিত্র্য তথা কৃষি-ইকোসিস্টেমে জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি ও ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছেন।

চ. কৃষক সংগঠন

গণগবেষণা মিটিং-এ নিয়মিত অংশগ্রহণের ফলে দলের কৃষকদের মধ্যে যৌথতার বোধ সৃষ্টি হয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে কৃষকদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাতক্ষীরার ধুমঘাট গ্রামের মুন্ডা জনগোষ্ঠীর কৃষকরা এভাবে একটি 'কৃষি উপকরণ সংগ্রহশালা' স্থাপন করেছেন, যেখানে কোদাল, কাস্তে, মাথালের মত বিভিন্ন কৃষি উপকরণ দলীয়ভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কৃষকরা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করছেন। প্রতিটি গ্রামে কৃষকরা বীজ ব্যাংক স্থাপনের জন্য নিজেদের সংরক্ষিত বীজের তালিকা তৈরি করেছেন। কৃষকরা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ফসল যৌথভাবে বিপণনের জন্য কাজ করছেন। এছাড়া কৃষকরা অন্য এলাকার কৃষক সংগঠনের সাথেও যোগাযোগ স্থাপনের কাজ করছেন।

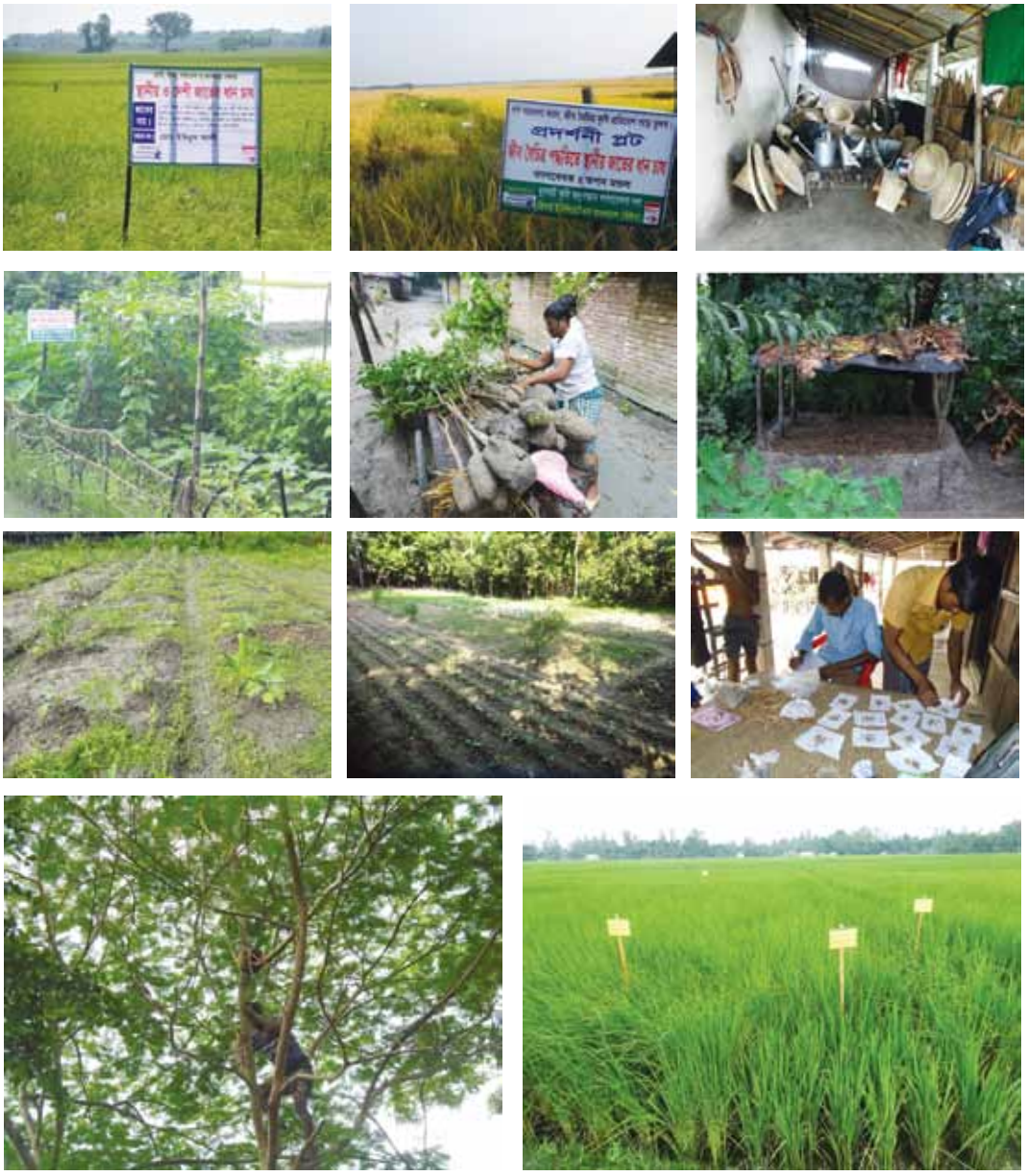

ছবি: গণগবেষকদের একশন

৪. জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ কর্মশালা

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল প্রস্তুত করার জন্য একটি ৫-দিন ব্যাপি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানী ড. দেবল দেব-এর তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ম্যানুয়ালটির খসড়া তৈরি করা হয়। এই কর্মশালায় প্রকল্প কর্মীরা ছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ হামিদুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের

(বারি) বিজ্ঞানীবৃন্দ ড. রনজিত সেন ও ড. খুরশিদ আলম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানীবৃন্দ ড. পান্না আলী ও মোঃ সিরাজুল ইসলাম, শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. অশোক কুমার ঘোষ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ শাহেদ হাসান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আশরাফুল ইসলাম, কর্মজীবী নারীর পরিচালক সানজিদা সুলতানা, প্রাকৃতিক কৃষির দেলোয়ার জাহান, বাংলাদেশ কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজেকুজ্জামান রতন অংশগ্রহণ করে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। কর্মশালার মাধ্যমে ম্যানুয়ালটির খসড়া প্রস্তুত করার পর রিইব এর কনসালটেন্ট কৃষিবিদ ড. জহির উল্লাহ ম্যানুয়ালটির আঙ্গিকগত দিকসহ সার্বিক পরিমার্জন করেন। ম্যানুয়ালটির খসড়া প্রস্তুত করার সময় প্রকল্প কর্মীবৃন্দ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করায় ম্যানুয়ালের বিষয়সমূহের উপর তাদের বোঝাপড়া পরিস্কার হয়ে যায়। ম্যানুয়ালটি প্রকাশের পর বিভিন্ন এলাকার কৃষকসহ দেশের কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে প্রচার করা হয়।

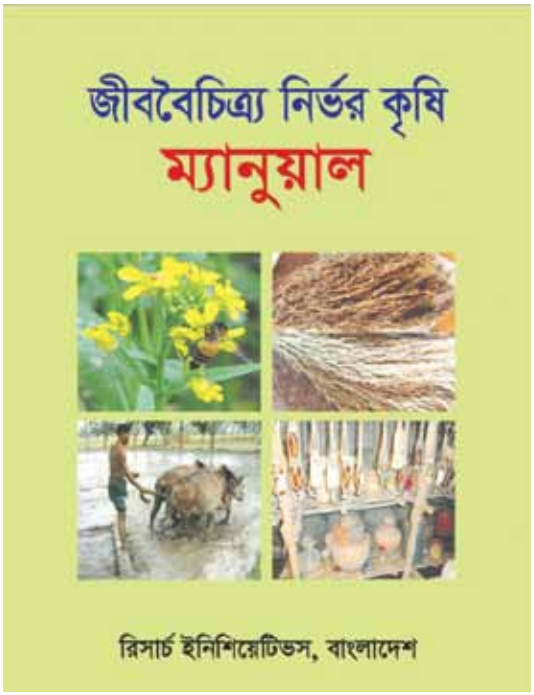





ছবি: জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ কর্মশালা

ম্যানুয়ালের অধ্যায়গুলো হচ্ছে যথাক্রমে: ১. কৃষির বর্তমান অবস্থা, ২. জীববৈচিত্র্য কৃষির মূলনীতি, ৩. কৃষি-ইকোসিস্টেম, ৪. মাটি ও পানি ব্যবস্থাপনা, ৫. জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষের পদ্ধতি, ৬. জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিতে নারীর ভূমিকা, ৭. উপসংহার।

৫. কৃষি শিক্ষণ কর্মশালা (আবাসিক কেন্দ্রীয়ভাবে)

গণগবেষণা দলের নির্বাচিত সদস্য ও প্রকল্প কর্মীদের জীববৈচিত্র্য নির্ভর সুস্থায়ী কৃষি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৭ সালে ২টি এবং ২০১৮ সালে ২টি আবাসিক স্কুল আয়োজন করা হয়েছে (প্রতিটি চারদিন ব্যাপি)। এসব কেন্দ্রীয় স্কুলে অংশগ্রহণের জন্য গণগবেষণা দলের সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন। ২০১৭ সালের মে মাসে নেত্রকোনার রামেশ্বপুর গ্রামে বেসরকারি সংস্থা বারসিক-এর রিসোর্স সেন্টারে প্রথম আবাসিক স্কুলটি আয়োজন করা হয়েছে। বারসিক দীর্ঘদিন ধরে সংস্কৃতি ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সুস্থায়ী কৃষি নিয়ে কৃষক ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করছে। বারসিক-এর কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় কৃষক সংগঠনের কৃষক এবং প্রকল্প কর্মীরা এখানে জীববৈচিত্র্য ম্যানুয়ালের বিষয়গুলো গণগবেষণা দলের প্রতিনিধিত্বকারী কৃষকদের সাথে আলোচনা করেন। ম্যানুয়ালের তত্ত্বীয় আলোচনা বুঝতে বারসিক-এর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও কৃষি খামার সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তিতে অক্টোবর মাসে ঢাকায় দ্বিতীয় আবাসিক স্কুলের আয়োজন করা হয়। এখানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তুহিন শুভ্র রায়, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. রনজিত সেন এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করা প্রবীণ কৃষিবিদ ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম। তাঁরা এই স্কুলে যথাক্রমে ধানের পোকা-বালাই, ক্যারেক্টারাইজেশন ও এসআরআই; মিশ্র চাষ পদ্ধতিসমূহ; এবং বালাই চিহ্নিতকরণ ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করেন।





ছবি: নেত্রকোনার রামেশ্বরপুরে আবাসিক স্কুলে গণগবেষক কৃষক ও প্রকল্প কর্মীরা

২০১৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় তৃতীয় আবাসিক স্কুল আয়োজন করা হয়। এই স্কুলে রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের ড. খুরশীদ আলম, ড. নাজিম উদ্দিন এবং ড. রনজিত সেন। তাঁরা যথাক্রমে জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ও জৈব কৃষি; জৈব চাষপদ্ধতি; এবং জৈব সার ও বালাইনাশক নিয়ে আলোচনা করেন। এছড়া প্রকল্প কর্মীবৃন্দ এই স্কুলে কৃষিতে নারী, জীববৈচিত্র্য কৃষি বিষয়ে চট্টগ্রামের কৃষকদের অভিজ্ঞতা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আলোকপাত করেন। সর্বশেষ আবাসিক স্কুলটি আয়োজন করা হয় এপ্রিল মাসে প্রকল্প এলাকা নীলফামারীতে। এই স্কুলে ভারতের সেন্টার ফর ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ এর প্রধান ড. দেবল দেব রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন










ছবি: নীলফামারী ও ঢাকার আবাসিক স্কুলে গণগবেষক কৃষক, প্রকল্প কর্মী ও রিসোর্স পার্সনবৃন্দ

এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক চক্র, ইকোসিস্টেমের নানান উপাদান ও তাদের সম্পর্ক, মনোকালচার ও মিশ্রচাষের পার্থক্য, রাসায়নিক কৃষি উপকরণের প্রভাব, কৃষি-ইকোসিস্টেমের বিবিধ অশস্য ও প্রাণিদের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার, ধানের ক্যারেক্টারাইজেশন, এসআরআই পদ্ধতিতে ধান চাষ, কমিউনিটি সম্পদ ব্যবহার, জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব, জৈব সার ইত্যাদি বিষয়ে তত্ত্বয় ও ব্যবহারিক আলোচনা করেন।

এই স্কুলগুলোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষিবিদ, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানীদের সাথে কৃষকদের জ্ঞান বিনিময় ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। কৃষকরা কৃষি ও পরিবেশের নানান বিষয়ে ধারণা পেয়েছেন যা তারা পরবর্তিতে চর্চা করেছেন এবং অন্য কৃষকদের সাথে শেয়ার করেছেন।









ছবি: স্থানীয় স্কুল

৬. কৃষি শিক্ষণ কর্মশালা (স্থানীয় পর্যায়ে)

আবাসিক স্কুলে অর্জিত জ্ঞান দলের সকল গণগবেষক কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ২০১৭ সালে প্রতিটি গ্রামে ২ পর্যায়ে ২টি করে মোট ১৬টি এবং ২০১৮ সালে প্রতিটি এলাকায় ১টি করে ৪টি লোকাল স্কুল আয়োজন করা হয়েছে (প্রতিটি ৩ দিন ব্যপি)। এই স্কুলগুলোতে আবাসিক স্কুলে অংশগ্রহণকারী কৃষকবৃন্দ ও প্রকল্প কর্মীরা অর্জিত জ্ঞান দলের অন্য কৃষকদের সাথে বিনিময় করেছেন এবং যেগুলো সম্ভব সেগুলো হাতে-কলমে চর্চা করেছেন। স্থানীয় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দও এই স্কুলগুলোতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৭. এক্সচেঞ্জ ভিজিট

অন্য এলাকার কৃষকদের কার্যক্রম থেকে শেখার জন্য ২০১৭ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে নীলফামারী ও সাতক্ষীরাতে ২টি এবং ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে ঝিনাইদহ ও সাতক্ষীরাতে ১টি এক্সচেঞ্জ ভিজিট আয়োজন করা হয়। এই ভিজিটে অংশগ্রহণের জন্য গণগবেষণা দলগুলো তাদের প্রতিনিধি বাছাই করে দেয়। গণগবেষক কৃষকরা ভিজিটে এসে অন্য এলাকার কৃষিক্ষেত, মাটি, পানি, ফসল ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য, গ্রামের অবস্থা, জীবন ধারণ পদ্ধতি প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন এবং স্থানীয় কৃষকদের সাথে অভিজ্ঞতা ও বীজ বিনিময় করেন। ২০১৮ সালের এক্সচেঞ্জ ভিজিটে রিইব এর প্রকল্পভুক্ত গ্রাম ছাড়াও বেসরকারি সংস্থা এইড ফাউন্ডেশন ও উন্নয়ন ধারা-র ঝিনাইদহের কর্ম এলাকা এবং বারসিক-এর সাতক্ষীরার কর্ম এলাকা পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট কৃষকদের সাথে মত বিনিময় করেন। এর মাধ্যমে ভিজিটে আসা কৃষকরা বিভিন্ন কৃষি-প্রতিবেশ এলাকার কৃষি, পরিবেশ ও জীবনধারার ভিন্নতার সাথে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি, ঐ এলাকার কৃষকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

৮. স্থানীয় পর্যায়ে সংলাপ বা ডায়ালগ আয়োজন

প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, গণমাধ্যম কর্মী, নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে রিইব-এর গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য ডায়ালগ মিটিং এর আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৭ সালে ৪টি প্রকল্প এলাকায় ৪টি এবং ২০১৮ সালে নীলফামারী, বগুড়া ও ঢাকায় ৩টি মিটিং আয়োজন করা হয়। আলোচনার সূত্রপাতের জন্য রিইব এর প্রকল্প কর্মীরা মিটিং-এ একটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন (সংযুক্তি-১ ও সংযুক্তি-২) এবং কৃষকরা তাদের কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এই ডায়ালগ মিটিং-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা কৃষি, প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক রাজনীতি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হোন এবং তাদের মতামত প্রদান করেন। এছাড়া বিকল্প কৃষি পদ্ধতি হিসেবে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির বিষয়েও তারা প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন। অংশগ্রহণকারীরা কৃষকদের কাজ সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করারও আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁরা এরকম আলোচনা আরও বেশি করে আয়োজন করা এবং অন্যান্য কৃষকদের মধ্যে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ছড়িয়ে দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত থেকে জানা যায় যে, এখন বিভিন্ন রাসায়নিক বিষ কোম্পানি কৃষকের ক্ষেতে সাইনবোর্ড লাগিয়ে নিজেদের পণ্যের প্রচার করছে। সরকারি









ছবি: এক্সচেঞ্জ ভিজিট

কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ খাদ্য নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখার কথাও বলেন। এছাড়া তাঁরা মনে করিয়ে দেন যে, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে কৃষকদেরকে রাসায়নিক বিষ ছাড়া বালাই দমনের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের মতে খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশ রক্ষা, এই দুটো বিষয়কে এক সাথে বিবেচনায় নিয়েই কৃষি পরিকল্পনা করতে হবে। ২০১৮ সালের ঢাকায় অনুষ্ঠিত ডায়ালগে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ও অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। তাদের সিলেবাসে এই বিষয়গুলো না থাকায় তারা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও জানতে চান এবং কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।








ছবি: লোকাল ডায়ালগ মিটিং

৯. কনসালটেশন মিটিং

প্রকল্পের ১ বছরের কাজ শেষ হওয়ার পর, ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, ঢাকার সিরডাপ অডিটোরিয়ামে একটি কনসালটেশন মিটিং আয়োজন করা হয়। এই মিটিং-এ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, কৃষি-সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি, নাগরিক ও কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, গবেষক, শিক্ষাবিদ, গণমাধ্যম কর্মী এবং কৃষকরা অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা মিটিং-এর কী-নোট পেপারের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করা হয় (সংযুক্তি-৩)। দুইজন কৃষক তাদের কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তারা তাদের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা বীজগুলো সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন, যার অনেকগুলোই তাদের এলাকা থেকে হারিয়ে গিয়েগছিল। অংশগ্রহণকারীরা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন। এসময় রাজনীতিবিদরা কৃষি বিজ্ঞানীদের অনুরোধ করেন যেন কোন কৃষি প্রযুক্তি প্রচারের আগে সেগুলোর ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি নেতিবাচক প্রভাবগুলোও সকলকে জানানো হয়। কেননা সবুজ বিপ্লবের ফলে ফসলের উৎপাদন যেমন বেড়েছে, অন্যদিকে মাটি, পানি, জীববৈচিত্র্য, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির উপর বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক প্রভাবও পড়েছে। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তিগুলো প্রচার ও প্রসারের আগে এই নেতিবাচক প্রভাবগুলোর কথা বলা হয়নি, সেসময় শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির কথাই বলা হয়েছিল। এছাড়া যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে সেই প্রকল্পের সুস্থায়ীত্ব, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব এবং আন্তঃপ্রজন্ম সমতার হিসাব সততার সাথে করার কথাও বলা হয়। মিটিং-এ কয়েকজন অংশগ্রহণকারী আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার না করলে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু কয়েকজন অংশগ্রহণকারী বলেন যে, রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার বাদ দিয়ে জৈব কৃষিতে ফেরা ছাড়া আমাদের আর



ছবি: জীববৈচিত্র নির্ভর কৃষি ম্যানুয়ালের মোড়ক উন্মোচন



ছবি: কনসালটেশন মিটিং এর অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বিকল্প নেই। রাসায়নিক কৃষির যে ভয়ঙ্কর পরিবেশগত, সামাজিক ও জনস্বাস্থ্যগত প্রভাব তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বাংলাদেশের মাটিতে ক্রমে জৈব উপাদানের যে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে তাতে কিছুদিন পর মাটির উর্বরতা শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তারা উদাহরণ দিয়ে দেখান যে, এখন সারা পৃথিবীতেই রাসায়নিক কৃষির নেতিবাচক প্রভাবের প্রেক্ষিতে জৈব কৃষি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি জনপ্রিয় হচ্ছে। তবে এসকল বিষয়ে আরও আলোচনার করার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীই একমত হোন।

এই মিটিং-এ আনুষ্ঠানিকভাবে রিইব প্রকাশিত জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়ালের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক কৃষিবিদ হামিদুর রহমান, অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট শামসুল হক রেজা, ঐতিহ্যবাহী ধানের সংরক্ষক ইউসুফ মোল্লা, প্রকল্প সমন্বয়ক সুরাইয়া বেগম এবং রিইব এর নির্বাহী পরিচালক মেঘনা গুহঠাকুরতা ম্যানুয়ালের মোড়ক উন্মোচন করেন। পরবর্তিতে হামিদুর রহমান, ড. রনজিত সেন এবং দেলোয়ার জাহান ম্যানুয়ালের উপর তাদের মতামত তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারীরা ম্যানুয়াল প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং এর বহুল প্রচার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

১০. জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি বিষয়ে গোলটেবিল সংলাপ বা ডায়ালগ আয়োজন

জলবায়ুর সাথে কৃষির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাই ২০১৮ সালের জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষিকে ফোকাস করে ২টি গোলটেবিল ডায়ালগ মিটিং আয়োজন করা হয়। প্রথম ডায়ালগ মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন সরকারি কৃষি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ। দ্বিতীয় মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ। এর আগে ২০১৭ সালে 'ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার' (জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি) বিষয়ে ঢাকায় ৩দিন ব্যাপি একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের কৃষিবিদ ও পরিবেশবিদরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত বর্তমান প্রকল্পের সহযোগী প্রকল্প হিসাবে এবং রোসা লাক্সেমবার্গের সহযোগীতায় এই দুইটি ডায়ালগ মিটিং-এ আলোচনার সূত্রপাতের জন্য কী-নোট পেপার উপস্থাপন করেন রিইব এর কনসালটেন্ট মো: সাইদুর রহমান (সংযুক্তি ৪)। পরবর্তিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি নিয়ে তাদের কার্যক্রম ও মতামত তুলে ধরেন। দ্বিতীয় ডায়ালগ মিটিং-এর দ্বিতীয় দিনে উভয় ডায়ালগের আলোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তির নামে যে কোন প্রযুক্তি প্রচারের আগে যথাযথ গবেষণা করে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরুপন এবং কৃষকের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারীরা মত দেন। কেননা উৎপাদন বৃদ্ধি করার অনেক প্রযুক্তির বিভিন্ন রকম নেতিবাচক প্রভাব এখন দেখা যাচ্ছে। এছাড়া সামগ্রিক কর্মকান্ডে জলবায়ু ও পরিবেশ ইস্যুকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়। এই দুইটি ডায়ালগের আলোচনার বহুল প্রচারের জন্য দুইটি ডায়ালগ প্রতিবেদন বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহীরা রিইব অফিসে যোগাযোগ করে বই দুইটি সংগ্রহ করার সুবিধা পাবেন।



ছবি: জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি বিষয়ে গোলটেবিল সংলাপ বা ডায়ালগ

১১. নারী কৃষকদের অবস্থান বিষয়ে একশন রিসার্চ



ছবি: বাংলাদেশের নারী কৃষকদের অবস্থান বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন

২০১৮ সালে নীলফামারী ও সাতক্ষীরা জেলার ৪টি গ্রামে নারী কৃষকদের অবস্থান বোঝার জন্য একটি একশন রিসার্চ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এজন্য ৪টি গ্রামে ১৫ জন নারী কৃষকের সমন্বয়ে ৪টি দল গঠন করা হয়। নারী কৃষকদের নিয়ে ৪টি গ্রামে ৩টি করে ১২টি দলীয় আলোচনা পরিচালনা করেন প্রকল্প সমন্বয়ক সুরাইয়া বেগম এবং কৃষক নারীদের পূর্বেকার এবং বর্তমান অবস্থ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করেন। নারী কৃষকদের দলগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা প্রকল্প কর্মীদের সহায়তায় গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। গবেষণা প্রতিবেদনে কালের পরিক্রমায় কৃষি কাজের সাথে নারীদের সম্পৃক্ততার পরিবর্তন, মাটি, পানি, বীজের মত বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার, বাজার ও পরিবর্তিত কৃষির বিভিন্ন কাজে প্রবেশাধিকার, নারী কৃষকদের বর্তমান অবস্থান প্রভৃতি উঠে এসেছে। গবেষণা প্রতিবেদনটি বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে।

১২. নির্বাচনী প্রার্থীদের কৃষি ভাবনা বিষয়ে গবেষণা

বাংলাদেশে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প এলাকাগুলোর নির্বাচনী আসনে যেসকল প্রার্থী সংসদ সদস্যপদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের কৃষি ও কৃষক বিষয়ে ভাবনা ও পরিকল্পনা জানার জন্য একটি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। গবেষণার আওতায় প্রার্থীদের সাক্ষাতকার গ্রহণ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহার পর্যালোচনা করা হয়। গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় একটি বই প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে।

১৩. শিক্ষামূলক প্রকাশনা

কৃষি-প্রতিবেশ, কৃষি-রাজনীতি ও কৃষিজ বিষয়সমূহ কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণের মাঝে প্রচার করার জন্য ২০১৭-১৮ সময়ে ৪টি শিক্ষামূলক প্রকাশনা বের করা হয়েছে এবং প্রচার করা হয়েছে। প্রকাশনাগুলো হচ্ছে:

১৩.১. বীজবৈচিত্র্য ও এর রাজনৈতিক অর্থনীতি

বীজ দিয়েই কৃষির শুরু। তাই বীজ বিষয়ে জানা-বোঝাটা থাকাটা জরুরি। সময়ের পরিক্রমায় কিভাবে বীজ পরিবর্তিত হয়েছে, বীজের সার্বভৌমত্ব, বীজ বিষয়ক সমালোচনা ও রাজনীতি এবং বীজ বিজ্ঞান এই বই এর আলোচ্য বিষয়।

১৩.২. নারী ও কৃষি-প্রতিবেশ

কৃষি-প্রতিবেশের সাথে নারীর সম্পর্ক এবং কৃষি-প্রতিবেশে জেন্ডার সম্পর্ক স্পষ্ট করার জন্য 'ফোকাস অন দ্যা গ্লোবাল সাউথ' প্রকাশিত "উইমেন, এগ্রোইকোলজি এন্ড জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি" বই অবলম্বনে বাংলা ভাষায় লিখিত বই। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কৃষিতে নারীর ভূমিকা ও জেন্ডার সম্পর্ক, কৃষি প্রতিবেশ কাঠামো রূপান্তর নিয়ে আলোচনা হয়েছে ।

১৩.৩. জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও কৃষি

জলবায়ু পরিবর্তন বোঝার জন্য জলবায়ুর উপাদান ও ভূগোল বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। এছাড়া জলবায়ু সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতি, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় পরিবেশের অবক্ষয় ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস এবং এগুলোর সাথে কৃষি ও কৃষকের সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই এই বইতে উপরোক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৩.৪. কৃষি প্রতিবেশ: ঐতিহ্য, বর্তমান ও ভবিষ্যত

বাংলাদেশে কৃষির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। সাহিত্যের নানান শাখায় এই ঐতিহ্যের খোঁজ পাওয়া যায়। এই বইতে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও গবেষকের লেখনী থেকে সেই ঐতিহ্যের বর্ণনা তুলে আনা হয়েছে। এর পাশাপাশি কৃষি-প্রতিবেশের বর্তমান অবস্থা, বৈশ্বিক রাজনীতি এবং আধুনিক শিল্প-খাদ্য-উৎপাদন-ব্যবস্থা ও কৃষকদের-খাদ্য-উৎপাদন ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।



ছবি: রিইব এর শিক্ষামূলক প্রকাশনা



ছবি: রিইব এর শিক্ষামূলক প্রকাশনা

১৪. জাতীয় সেমিনার

প্রকল্প কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা নিয়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় করার জন্য ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ২ দিন-ব্যপি একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কৃষি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ ও নীতি-নির্ধারকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া রিইব এর প্রকল্পভুক্ত কৃষক, সুস্থায়ী কৃষি নিয়ে কাজ করা ৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এইড ফাউন্ডেশন, বারসিক ও উন্নয়ন ধারা) সংশ্লিষ্ট কৃষক এবং অন্যান্য কৃষকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেমিনারের প্রথম দিনে প্রকল্প পরিচালক কী-নোট পেপারের মাধ্যমে প্রকল্পের পটভূমি ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন (সংযুক্তি ৫)। অংশগ্রহণকারীরা রিইব এর কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কথা বলেন এবং সামগ্রিক কৃষি নীতিতে খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার উপর জোর দিতে বলেন। পরবর্তিতে উপস্থিত কৃষকরা তাদের কৃষি অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং সুস্থায়ী কৃষির নানান পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন।



ছবি: জাতীয় সেমিনারের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ



ছবি: সেমিনারে বীজ প্রদর্শনী

সেমিনারের দ্বিতীয় দিন কৃষক ও কৃষি নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করা কর্মীবৃন্দ জীববৈচিত্র্য নির্ভর/ জৈব/ সুস্থায়ী কৃষি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন:

- মনে করা হয় এ ধরনের কৃষিতে উৎপাদন কম । কারণ সাধারণত উৎপাদন বলতে শুধু নিদিষ্ট ফসলের উৎপাদন বোঝান হয় । কিন্তু কৃষিতে উৎপাদনের আওতায় মাটির স্বাস্থ্য, কৃষকের স্বাস্থ্য, ফসলের গুণগতমান, ক্ষেতে জীববৈচিত্র্যের পরিমাণ (অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণি), অন্যান্য সাথী ফসল ও প্রাণির উৎপাদন, পরিবেশ দূষণ হচ্ছে কিনা বা খরচের হিসাবও আসা উচিৎ ।
- মাটির উর্বরতা শক্তি কমে গেছে
- জৈব কৃষি উপকরণ সহজলভ্য নয় এবং ব্যবহার ঝামেলাপূর্ণ
- বিষমুক্ত ফসলের আলাদা বাজার নেই । ভোক্তারা খাদ্যে রাসায়নিক বিষের ব্যাপারে সচেতন নন
- ভোক্তারা আগাম ফসল পছন্দ করেন এবং মৌসুম ছাড়াও কিছু নির্দিষ্ট ফসল চান, যা জৈব কৃষিতে সম্ভব হয় না
- নিরাপদ কৃষি ফসল আসলেই নিরাপদ কিনা তা পরীক্ষা করার জায়গা নেই
- অঞ্চলভিত্তিক হিমাগার বা গুদাম নাই
- ফসলে পোকার দাগ দেখলে বিক্রি হয় না, বাজারেও ফেলতে দেয় না, ভোক্তাদেরকে বোঝাতে হয়, বুঝলে দ্রুত বিক্রি হয়ে যায়
- ঢাকায় জৈব ফসলের দাম বেশি, সব সময় পাওয়া যায় না

- কার্যকর জৈব প্রযুক্তির অভাব
- এ সংক্রান্ত ঐতিহ্যবাহী কৃষি জ্ঞান হারিয়ে গেছে
- এ সংক্রান্ত সরকারি বা বেসরকারি গবেষণার ঘাটতি রয়েছে, বা গবেষণা হলেও কৃষকের কাছে পৌছাচ্ছে না
- বিভিন্ন কোম্পানির প্রলোভন (প্রথমে হাইব্রীড/ উফসী বীজ দিবে বেশি ফলনের কথা বলে, এরপর সার, বিষ ও অন্য প্রযুক্তি দিবে) । আগে বিনা পয়সায় দিত, এখন কয়েক গুণ দাম । অনেক সময় ভুল তথ্যও দেয় । এতে কৃষকের জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে ।
- কৃষকরা দ্রুত ফলন চান
- কৃষকরা তাৎক্ষনিক লাভ চাচ্ছেন, উৎপাদন খরচের হিসাব বা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির হিসাব করেন না
- কৃষকরা ঋণগ্রস্ত, সবসময় লাভ করার টেনশনে থাকেন
- জৈব কৃষিতে ভর্তূকী নেই
- সরকারিভাবে জৈব চাষীদেরকে কোন আলাদা সম্মান বা সম্মানী বা সুবিধা সরঞ্জাম দেওয়া হয় না
- যেসব সুস্থায়ী প্রযুক্তি এখন পর্যন্ত আছে, সেগুলোর প্রদর্শনী প্লট বা প্রচার নেই
- বীজ বৈশিষ্ট্যকরণ ও সংরক্ষণের জ্ঞানের অভাব
- এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে
- কোথায় গেলে এ বিষয়ে সহায়তা পাওয়া যাবে তা জানা নেই
- অনেক সময় জৈব কৃষি বিষয়ক বই/ ডকুমেন্টগুলো কৃষকরা পড়তে পারেন না (বড় ব্যানার, ফেস্টুন, সাইনবোর্ড)
- জৈব কৃষি উপকরণ তৈরি করার জন্য উপাদান কমে গেছে (গবাদি পশু, আগাছা/ সঙ্গী উদ্ভিদ)
- সঙ্গী উদ্ভিদের, প্রাণীর নাম ও কার্যকারিতা অনেকেই ভুলে গেছেন
- পাখির বাসা তৈরি করার উপযোগী গাছ কমে গেছে, ফলে পাখি কমে যাচ্ছে
- অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণি হারিয়ে গেছে
- জমি নেওয়ার খরচ অনেক বেশি
- স্থানীয় বীজের অভাব
- ফসলের জাত বৈচিত্র্যতার অভাব
- কৃষি শ্রমিকের অভাব
- কৃষকের মধ্যে জ্ঞান বা বীজ বা অন্যান্য বিনিময় হ্রাস পেয়ে গেছে
- আবাদি জমি হ্রাস পাচ্ছে
- সংগঠিত কৃষকের অভাব, কিছু জায়গায় আছে, সব জায়গায় নেই (কৃষকের হাতে ক্ষমতা নেই)
- ট্রাক্টর দিয়ে অল্প সময়ে বেশি জমি চাষ করা যায়, কিন্তু এতে প্রাণিরা মারা যায়, মাটির গুণ নষ্ট হয়
- যারা জৈব কৃষি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, তাদের মধ্যেও কেও কেও ব্যবহার করেন না, বা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না
- গরুর হালের সংকট
- পাশের জমিতে রাসায়নিক দিয়ে আবাদ করা হয়

- জৈব চাষ হবে কি না তা নিয়ে অনেক কৃষকের সংশয় আছে
- কৃষকের সন্তানেরা কৃষক হতে চাচ্ছে না (বিশেষ করে মেধাবী সন্তানদের কৃষিতে আনছে না)
- কৃষক নিজের পরিচয় দিতে চায় না বা কৃষিকাজে থাকতে চাচ্ছেন না
- কৃষকরা সংগঠিত না
- কৃষকের ভাতের উপর নির্ভরশীলতার ফলে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য উৎপাদনে আগ্রহী নয়
- চিংড়ি চাষ বা প্রভাবশালীদের অন্যান্য ভূমিদখলকারী ও পরিবেশ ধ্বংসকারী কার্যক্রম
- কৃষকদের ধারণা রাসায়নিক ছাড়া চাষ হবে না
- রাসায়নিক সার বেশি দেওয়ার প্রবণতা
- জৈব কৃষি বিষয়ে সরকারি প্রচারণা নেই
- ফসলের উৎপাদনের পরিমাণের উপর কৃষকের অসন্তুষ্টি
- অন্যের জমি জৈব চাষ করে, ছেড়ে দিলে, আবার রাসায়নিক চাষ শুরু হয়ে যায়
- জৈব চাষের জন্য জমি নির্বাচনও কঠিন, আশেপাশে রাসায়নিক চাষ হয়
- খাদ্য নিরাপত্তার ভয়
- জাতীয় জেব নীতি বিষয়ে অনেকেই জানে না
- জৈব কৃষি বিষয়ে রাজনৈতিক দলের অসম্পৃক্ততা
- কোম্পানি নির্ভর বা স্থানীয় বাজারের কৃষি উপকরণ দোকানদারের জ্ঞানের উপর কৃষকের নির্ভরশীলতা
- একাডেমিক বা লেখাপড়ার জায়গায় জৈব কৃষি নেই ।

উপসংহার

দুই বছরের প্রকল্প পরিচালনার মূল্যায়ন করতে গেলে যে বিষয়টা উল্লেখ করতে হয় তা হচ্ছে কৃষি বিষয়ক কর্মকাণ্ডে রিইব নতুন মাত্রা যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধি, আত্মউন্নয়নে সক্ষমতা অর্জন, সাধারণ কৃষকদের সাথে দক্ষ কৃষক এবং যারা কৃষি বিষয়ে দক্ষ তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে সহায়তা করছে রিইব। কৃষিক্ষেত্রে রিইব এর এই প্রকল্পের অনন্যতা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষকদের আত্মউন্নয়নে তত্ত্ব এবং বাস্তবতায় যে দূরত্ব তার মধ্যে সেতু বন্ধন করা।

রিইব এর কাজ করার ক্ষেত্রে যে জায়গাটা চ্যালেঞ্জিং তা হচ্ছে বর্তমানে যে ধারায় কৃষিকাজ হচ্ছে তা হচ্ছে রাসায়নিক সার বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে নিবিড় চাষ ব্যবস্থা। রিইব এই জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। তবে রিইব নিজেকে কখনই বিষয় বিশেষজ্ঞের সেই স্তরে নিজেকে দেখতে চায় না, যারা সকল সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রেখে থাকে, মতামত দিয়ে থাকে। কারণ তা গণগবেষণা বা Participatory Action Research (PAR) দর্শনের বিরোধি, যে দর্শনে রিইব বিশ্বাস করে। রিইব স্থানীয় জ্ঞান এবং বিশেষায়িত জ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। কারণ জ্ঞান হচ্ছে রাজনৈতিক বিষয়।

গণগবেষণা বিষয়ক বিশ্লেষণ

এই প্রকল্পে গণগবেষণা দল বিশেষভাবে কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করে থাকে, তাদের ফোকাস জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিতে। কিন্তু চঅজ একটি সামগ্রিক পদ্ধতি (holistic approach)। এমনও দেখা গেছে যে, গণগবেষণা দলে আলোচনা করতে করতে এমন অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়, কিংবা PAR মিটিং-এর out come হিসেবে এমন কিছু বলা বা করা হয়েছে যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত নয়, সেসব রিইব এর রিপোর্টের এর বাইরেই থেকে যায়।

তবে এই গণগবেষণা দর্শনের অনুধাবনের জন্য সময় প্রয়োজন, যাতে কৃষকরা সম্পূর্ণরূপে এই দর্শনকে অনুধাবন করে অনুসরণ করতে পারে। এটা এত সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার নিরবিচ্ছিন্নভাবে লেগে থাকা, বিশেষ করে যেখানে কৃষকদের জন্যে নানারকম আকর্ষণীয় প্যাকেজ নিয়ে অন্যান্য গোষ্ঠী যারা রাসায়নিক সার, বিষ প্রণোদনা দিতে চায়। তারা কৃষককে সম্পৃক্তরণে বাজার ভিত্তিক চর্চাগুলোতে ওঁত পেতে থাকে। অন্যান্য স্থানীয় এনজিওরা এইসব কৃষকদেরকে বিভিন্নরকম সহযোগিতার কথা বলে থাকে তাদের প্রকল্প কাজের সার্থকতা প্রদর্শনের জন্য।

এখানে উল্লেখ্য যে, একজন গবেষণা সহকারি একটি এলাকায় এককভাবে এই সব PAR গ্রুপের সচেতনায়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, স্থানীয় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলোকে নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা এবং প্রজেক্ট সংক্রান্ত বিষয়ে থেকে আপডেট করা, জ্ঞান সঞ্চালন এবং ট্রেনিং, ডায়ালগ অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থাপনাসহ প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রকল্পের কাজের তথ্যকরণে রিসার্চ এ্যাসিসটেন্টদেরকে একটা বড় সময় ব্যয় করতে হয়।

এত ছোট একটি টিম নিয়ে ৪টি জেলায় সকল কর্মকান্ড গণগবেষণার মাধ্যমে সম্পাদন করা কোন কোন ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং ছিল। সেক্ষেত্রে সমস্যার গভীরে গিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করা সব এলাকায় শতভাগ সক্ষম হয়নি, কোথাও মনযোগ কম হয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রামে ভাষাগত সমস্যা এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। যদি কম এলাকা নিয়ে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করা যায় এক্ষেত্রে আরও ভালভাবে উদ্দেশ্যের লক্ষ্য অর্জন সহায়ক হবে।

কৃষি প্রতিবেশ বিষয়ক আবাসিক ও স্থানীয় স্কুল

কৃষি প্রতিবেশ নির্ভর স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে একথা বলা যায় যে, রিইব ইতিমধ্যেই এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করেছে। কারণ রিইব-ই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যে তাদের সকল গবেষণার ক্ষেত্রে গণগবেষণা মতাদর্শকে প্রয়োগ করে থাকে। রিইব এর যেসব জায়গায় বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য– (১) PAR বা গণগবেষণা, (২) তথ্য অধিকার আইন, (৩) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে অধিকার নিয়ে কাজ এবং (৪) বর্তমানে বিকল্প কৃষি বা কৃষি প্রতিবেশ। এ থেকে বলা যায় যে, রিইব একটি রিসোর্স সেন্টারে পরিণত হবার জন্য যোগ্যতা অর্জন করে চলেছে এবং ক্রমশ: এটি সংহত রূপ নিয়ে ভবিষ্যতে আরও ভাল কাজ করার প্রেক্ষিত তৈরি করছে।

কৃষি-প্রতিবেশ বিষয়ে রিসোর্স সেন্টার-এ পরিণত হবার জন্য যেসব কাজ গুরুত্বপূর্ণ তা আরও অনেক বেশি করা প্রয়োজন। যেমন (১) জ্ঞানচিন্তার উন্নয়ন (অভ্যন্তরীণভাবে যেমন তেমনি দেশের বাইরে এ সংক্রান্ত যেসব নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং দেশজ প্রেক্ষাপটে আত্মস্থ করে পুনরুৎপাদন করা জরুরী। (২) কৃষি প্রতিবেশ বিষয়ক আরও প্রকাশনা করা দরকার বাংলা ভাষায়, যাতে গ্রাম পর্যায়ের স্বল্পশিক্ষিত কৃষকেরা এই জ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে পারে, জানতে পারে। আর সে কারণে এসব প্রকাশনা বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে বিষয় সম্পর্কে সমাজের সকল স্তরের জনগণ অবহিত হতে পারে। এ বিষয়ে রিইব ২০১৮ সালে যথেষ্ট যোগ্যতরভাবে কাজ সম্পাদন করেছে। কার্যক্রম ভিত্তিক এবং জ্ঞানভিত্তিক ০৮টি প্রকাশনা সম্পাদন করেছে। যা সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে এবং কোলকাতাসহ সারাদেশে চাহিদা তৈরি করেছে।

আমরা ভবিষ্যতে কৃষি-প্রতিবেশ সম্পর্কিত একটি রিসোর্স সেন্টার হিসাবে নিজেদেরক প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কারণ বাংলাদেশে এই বিষয়ে এখনও অনেক কাজ করা বাকি। বিশেষ করে জ্ঞানের উন্নয়ন (অভ্যন্তরীণভাবে এবং বাহ্যিকভাবে), বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে জ্ঞান তৈরি এবং বিতরণ, আরও অনেক বেশি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা জরুরী, কৃষি-প্রতিবেশ বিষয়ে এসব ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে।

বিশেষ করে কৃষি স্কুলগুলো জ্ঞানচর্চা, জ্ঞানের বিকাশ এবং জ্ঞানের প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ এগ্রোইকোলজি স্কুল খুবই কার্যকরি একটি পদ্ধতি এবং গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। কৃষির রাজনৈতিক দিকগুলোকে সামনে নিয়ে আসতে এই স্কুল বিশেষভাবে কার্যকরি। কৃষকদের চিন্তাভাবনাকে ধারালো করার জন্য এই স্কুলের সময়সীমা আরও দীর্ঘ হতে হবে।

এর জন্য আরও যা করা যেতে পারে তা হচ্ছে– (১) বাইরের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি, বিশেষজ্ঞ কৃষকদেরকে আরও বেশি প্রকল্পে যুক্ত করা, (স্বেচ্ছা ভিত্তিতে), ড. দেবল দেব-এর মত বিশেষজ্ঞদের মত আরও অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে যোগাযোগ ও সংযুক্ত করা। প্রশিক্ষণের জন্য মডিউল/ কারিকুলাম তৈরি করতে হবে। প্রকাশনার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, বাংলাদেশি কৃষকদের জন্যে সহজ বাংলায় বিভিন্ন শিক্ষণীয় উপকরণ ছাপাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিইব। ভবিষ্যতে ৮-১০ পাতার ছোট ছোট শিক্ষণীয় বুকলেট ছাপানো যেতে পারে। এসব বুকলেট প্রকাশনায় রিইব-এর প্রকল্প ব্যক্তি বা বাইরের কাউকে দিয়ে করানো যেতে পারে।

রিইব এর কৃষি প্রতিবেশ বিষয়ক যতগুলো প্রকাশনা বের হয়েছে সবগুলোই সমাদৃত হয়েছে, গবেষক, একাডেমিশিয়ান, এনজিও, সরকারি আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে। তারা সকলেই বইটির একাধিক কপি চেয়েছেন কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, তাদের বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামে এসব বই তারা পড়াতে চান। এটা রিইব-এর জন্য একটা বড় অর্জন।

এক্সচেঞ্জ ভিজিট

কৃষকদের জন্যে এক্সচেঞ্জ ভিজিট ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা দেখার মাধ্যমে তারা তাদের স্থবির চিন্তা চেতনা বা মাইন্ডসেট থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছে। বিশেষ করে যখন অন্যান্য এলাকায় কৃষি-প্রতিবেশ বিষয়ক কাজ দেখতে পেয়েছে, যেখানে কৃষকরা সফলতার সাথে বিকল্প কৃষি করছে। এখানে উজ্জীবিত হয়েছে উভয় কৃষকই, যারা দেখতে গেছে, যারা নিজের সফলতাকে দেখাতে পারছে। এর মাধ্যমে পারস্পরিক বিনিময়ও হয়েছে। বীজ বিনিময়, টেকনোলজি, চাষপদ্ধতি, জৈব কীটনাশক এবং বালাইনাশক তৈরি পদ্ধতি, ফসলের বৈচিত্র্য এবং বিশেষ করে জ্ঞান বিনিময় হওয়াটা ছিল উল্লেখযোগ্য। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন জিজ্ঞাসা সামনে এসেছে, বিভিন্ন নতুন বিষয় আলোচনা হয়েছে, যা নতুন নতুন বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে রিইবকেও উদ্বুদ্ধ করেছে।

লোকাল ডায়ালগগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে কৃষক ও সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক চেনা জানা এবং মত বিনিময় সম্ভব হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা অনেক সময় আমাদের বক্তব্যে আস্থা রাখতে চায় না, কিন্তু যখন তাদের স্থানীয় কৃষকরা কৃষি-প্রতিবেশ এর পক্ষে বলে তখন তারা সে কথা অস্বীকার করতে পারে না এবং গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। এই ডায়ালগ ক্রমশ: আরও অন্যান্যদের সাথে মত বিনিময় করার জানালা খুলে দিয়েছে। যেমন স্থানীয় পর্যায়ে যারা কাজ করে যেমন অন্যান্য এনজিও কর্মী, মিডিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সাংবাদিকবৃন্দ, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ইত্যাদির সঙ্গে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এটি সম্ভাবনার দিক।

বাংলাদেশে কৃষি, কৃষক ও কৃষি-প্রতিবেশ বাম রাজনৈতিক দলগুলোর মূল কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ দলের আদর্শের কারণে। সেই হিসাবে আমরা ডায়ালগে বাম দলগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়ভাবে কথা বলেছি। আমরা দেখেছি যে, বিকল্প কৃষি বা কৃষি-প্রতিবেশ নিয়ে বামদলগুলোর চিন্তাভাবনা এখনও গতানুগতিক। সুস্থায়ী কৃষি নিয়ে বিতর্কে তাদের আরও বেশি খোলামেলা হওয়া দরকার, এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে আরও কাজ করতে হবে। তবে ইদানীং বামদলগুলোর পোস্টারে পরিবর্তনের ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

অর্জন

রিইব গণগবেষণা কার্যক্রমে মোট ১২০ জন কৃষক নিয়ে কাজ করছে ৪টি জেলায়। রিইব বিদ্যমান প্রবাহিত ধারার বিপরীতে গিয়ে কৃষকদেরকে কৃষি-প্রতিবেশ ধারায় নিয়ে আসার জন্যে কাজ করছে। এটি খুব সহজ কর্মকান্ড নয়। এর জন্যে প্রচুর সময় কৃষকদের সাথে ব্যয় করতে হয়, তাদেরকে সচেতন করতে বিভিন্ন উদাহরণ সামনে তুলে ধরতে হয়। এক্ষেত্রে মাত্র দুইবছর হলো কৃষকদের সাথে আমাদের ভাবনা তুলে ধরা। প্রকল্পের সকল কর্মীবৃন্দ এক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে সময় দিয়েছে। আর তার ফলাফল হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ১২০ জন কৃষকই বিকল্প কৃষিতে মনোনিবেশ করেছে এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে তাদের সামর্থ্যের মধ্যে। এখানে বছর শেষে মনিটরিং এবং মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা আশান্বিত হয়েছি। দেখা গেছে যে, ১২০ জন কৃষকের মধ্যে ২৯ জন অর্থাৎ ২৪% তাদের খামারে প্রদর্শনী প্লট করেছে এবং তাদের প্রদর্শনী প্লট এলাকার অন্যান্য কৃষককে উদ্বুদ্ধ করেছে বিকল্প কৃষি করতে। প্রদর্শনী প্লট ছাড়াও তারা জৈব কৃষির অন্যান্য দিকগুলো চর্চা শুরু করেছে। এজন্যে তাদেরকে এলাকায় অনেক ধরনের অপ্রিয় কথা শুনতে হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা অন্যান্য কৃষকদের মনে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে যে, কৃষকের সুস্থায়ীত্ব নির্ভর করবে জৈব কৃষি চর্চায়, কিন্তু তা রাতারাতি সম্ভব নয়। এর জন্য ধৈর্য্য, পরিশ্রম, জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কৃষকরা বিশ্বাস করে পরিবর্তন আনা অসম্ভব ব্যাপার নয়। কৃষকদের সাথে সাথে আমরাও বিশ্বাস করি যে, পরিবর্তন সম্ভব। সেই লক্ষ্যেই রিইব এবং এর কর্মীবৃন্দ কাজ করে যাচ্ছে। রিইব-এর এই যাত্রায় রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং সহযোগী হিসাবে ভূমিকা রেখে চলেছে।

কৃষি-প্রতিবেশ নির্ভর কৃষি চর্চার মাধ্যমে কৃষি কাজ করলে প্রকৃতি পরিবেশ ভালো থাকে। সুতরাং কৃষি প্রতিবেশকে সুস্থায়ী করার জন্য দেশের সকল সেক্টরের নিয়োজিত কর্মীবৃন্দসহ নীতিনির্ধারক পর্যায়েও পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সবাইকে একমত হয়ে কাজ করে যেতে হবে। তাহলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা একটা বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে পারি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা কাজ করছি।

সংযুক্তি-১
(২০১৭ সালে রিইব আয়োজিত লোকাল ডায়ালগ মিটিং এর কী-নোট পেপার)
প্রান্তিয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি-প্রতিবেশঃ শিক্ষণ এবং গণগবেষণা
সুরাইয়া বেগম

সনাতনী কৃষির বদলে বর্তমানের কৃষি অনেক আধুনিক। কৃষিতে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষিকে করেছে গতিময়। বিভিন্ন ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন, কৃষি গবেষণা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার প্রকল্প এবং কৃষকের নিরলস পরিশ্রম- প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি করতে যেয়ে, বালাইনাশক. কৃষি তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, রাসায়নিক সার, সেচের পানির যথেচ্ছ ব্যবহারে আজকের আধুনিক কৃষি আবার হুমকির মুখেও পড়েছে। কারণ এখনকার কৃষিকাজগুলো বেশিরভাগই নির্মল পরিবেশের জন্য সহায়ক নয় (কৃষি মন্ত্রণালয়) । যেসব বালাইনাশক ও সার কৃষিতে ব্যবহার করা হয় অধিকাংশই রাসায়নিক। রাসায়নিক দ্রব্যাদির নির্বিচার ও যথেচ্ছ ব্যবহারে জলজ, প্রাণিজ ও ক্ষেতে থাকা উপকারী প্রাণীগুলো অহরহ মারা যাচ্ছে।

উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গিয়ে কৃষকরা পরিবেশ- প্রতিবেশের দিকে নজর দিচ্ছে না এবং পরিবেশবান্ধব চাষ পদ্ধতিগুলো ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সবাই খাদ্য শৃঙ্খলের কথা ভুলে গেছে। যেখানে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। একজন মারা পড়লে অন্যের খাদ্যের অভাব ঘটবে, হারিয়ে যাবে প্রাণবৈচিত্র্য। পরিবেশ হবে বিপর্যস্ত। কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি যখন পানিতে মিশে তখন জলজ প্রাণীগুলো মারা যায় আর যে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায় তারাও থাকে অরক্ষিত। এছাড়া ক্রমাগত রাসায়নিক পদার্ধ প্রয়োগ ও সেচের পানির গুনাগুন না জেনে জমিতে দেয়ার ফলে অনুজীব, কেঁচো প্রভৃতি মারা যাওয়ায় আর বিভিন্ন ধাতুর বিষক্রিয়ায় মাটি হারায় অতি মূল্যবান উর্বরা শক্তি। সব মিলিয়ে আমাদের কৃষি প্রতিবেশ ও পরিবেশ আজ হুমকির মুখে।

এছাড়া ষাটের দশকের পর থেকে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে চালু হওয়া এই রাসায়নিক নির্ভর আধুনিক কৃষির যে কুফলগুলো আমাদের চিন্তার কারণ হয়েছে সেগুলো হলঃ

ক) মাটির উর্বরতা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, ফলে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হচ্ছে
খ) অথচ উৎপাদন ক্রমশ কমছে
গ) কীটনাশক বিষের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে
ঘ) অথচ শত্রু পোকার সংখ্যা ও প্রভাব বেড়ে চলেছে
ঙ) সেচের প্রয়োজনে ভূ-গর্ভস্থ পানি যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলেঃ
   অ) পানির স্তর ক্রমশ নিচে চলে যাচ্ছে, পানির স্টক নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে এবং সেচের খরচ বেড়ে যাচ্ছে

আ) অন্তত ৪২ টি জেলায় পানিতে আর্সেনিক দূষণ বেড়ে যাচ্ছে

চ) খাদ্য ও পানিতে এই রাসায়নিক বিষ মিশে যাচ্ছে, ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে এবং ক্যনসারের মত দুরারোগ্য ব্যাধিও বেড়ে চলেছে; মাতৃদুগ্ধেও এই বিষ মিশে যাচ্ছে এবং শিশুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

ছ) চাষীর বন্ধু প্রাণীরা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, অনেক পোকা, মাছ, সরিসৃপ, ব্যাঙ, পাখি এবং মাটিতে বসবাসকারী অনেক প্রাণী ইতোমধ্যেই লোপ পেয়ে গেছে

জ) কৃষক বীজের জন্য বাজারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে গেছে

ঝ) কৃষির যাবতীয় সরঞ্জাম (ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পাম্প, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক, সার প্রভৃতি) এর জন্য কৃষক বিশেষ কিছু কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে

ঞ) এক শস্যের নিবিড় চাষের (মনোকালচার) ফলে শস্যবৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে

ট) কৃষির যাবতীয় পরম্পরাগত জ্ঞান হারিয়ে কৃষক কৃষি পদ্ধতির জন্যও বিভিন্ন কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে

ঠ) যন্ত্রনির্ভরতা ও বাজার নির্ভরতার ফলে ঐতিহ্যবাহী কৃষি সরঞ্জাম (লাঙল, ঢেঁকি, জাঁতা, ঘানি প্রভৃতি) এবং বলদ ও মহিষের ব্যবহার লোপ পেয়ে গেছে

ড) চাষের খরচ অনেক বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও রোজগার যথেষ্ট না হওয়ায় কৃষক কৃষিকাজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে

ঢ) কৃষি সংস্কৃতি ও স্থানীয় খাদ্য সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে।

এগুলোর বিপরীতে পৃথিবীব্যাপী কৃষিবিজ্ঞানী, পরিবেশবিজ্ঞানীরা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিকে মুক্তির পথ হিসেবে সুপারিশ করছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব দেশের ঝুঁকি বাড়বে তার মধ্যে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য। কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, অবকাঠামো এবং সর্বোপরি আমাদের জীবন জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় অবলম্বনের সব ক্ষেত্রেই জলবায়ুর সরাসরি প্রভাব রয়েছে। এর ফলে শস্যের গুণাগুন ও উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আসবে। পানির স্বল্পতা ও মাটির উর্বরতা কমে যাবে, নতুন বালাই দেখা দিতে পারে, ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি ও শস্যের বৈচিত্র কমে যেতে পারে। তবে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলে এর ক্ষতিকর প্রভাবকে কম বেশী নিয়ন্ত্রন বা পরিহার করা যেতে পারে। দূর্যোগের সময় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট দূর্যোগের ক্ষতি পরিহার করা যায় অথবা ক্ষতির সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায়।

এ পরিস্থিতিতে যে ধরনের কৃষিতে মাটি, পানি, বায়ু দূষণ হবে না; কৃষক ও ক্রেতাদের স্বাস্থ্য, প্রতিবেশের সুরক্ষা হবে, পরিবেশের জীববৈচিত্র্যও হুমকির মুখে পড়বে না, এ ধরনের পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। পরিবেশ দূষণ রোধ করে যে কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন আগামী দিনের কৃষিকে সে আঙ্গিকে সাজাতে হবে। এজন্য জৈব সার ও বালাইনাশকের ব্যবহার, বীজ সংরক্ষণ, কৃষি জমি হ্রাস রোধকরণ, স্থানীয় জাতের পুষ্টি ও অন্যান্য গুণে সমৃদ্ধ বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ সম্প্রসারণ, কৃষি প্রতিবেশ অনুযায়ী চাষাবাদ, বনায়ণ ও ফসল উৎপাদন- প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ

করতে হবে এবং সব স্তরের জনগণকে এসব ব্যাপারে ব্যাপকভাবে সচেতন করতে হবে। পাশাপাশি বিশাল সংখ্যক ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার দিকেও মনোযোগী হবে হবে। বিভিন্ন ফসলের হারিয়ে যাওয়া বৈচিত্রতা ফিরিয়ে এনে পুষ্টি, স্বাদ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের প্রতিবেশ, জনস্বাস্থ্য, সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং দেশের কৃষির টেকসই উন্নয়নে জন্য এখন একান্ত প্রয়োজন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) ও রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং নিচের উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছে:

- বাংলাদেশে কৃষির উৎপাদনে বিভিন্ন প্রতিবেশগত এলাকায় (এগ্রোইকোলোজিকাল জোন) বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি একশন রিসার্চের (গণগবেষণা) মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা;
- জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিকাজ করার জন্য স্থানীয় বা লোকজ কৃষি চর্চা প্রসারিত করা;
- কৃষি-প্রতিবেশ এবং পরিবেশের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সাম্প্রতিক বৈশ্বিক ও স্থানীয় জ্ঞান সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করে তোলা;
- অনুধাবন, শিক্ষণ এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে রাজনীতিবিদ, নীতি নির্ধারক, কৃষিবিদ এবং নাগরিকদের মাঝে প্রচার ও প্রসার করা

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি কী?

রাসায়নিক কৃষি প্রচলনের আগে পর্যন্ত যে কৃষিপদ্ধতি দশ হাজার বছর ধরে সারা পৃথিবীতে চালু ছিল সেই সাবেকী কৃষি ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি নির্ভর, সেটাই জীব বৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি। অর্থাৎ এই ঐতিহ্যবাহী কৃষি পদ্ধতি কোন বিকল্প পদ্ধতি নয়, এটাই ছিল মূলধারা, যতদিন না রাসায়নিক ও যন্ত্রশিল্প ব্যবসায়িক লাভের উদ্দেশ্যে এই কৃষিকে দখল করে। আজ সমস্ত কৃষিরাসায়নিক, বীজ ও যন্ত্র কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির দখলে। জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি কোম্পানির দখল থেকে চাষীকে মুক্তি দেয়, কারণ বীজ, সার ও শত্রু পোকা নিয়ন্ত্রন করার জন্য চাষীকে বাইরের কোন বস্তু বা সংস্থার উপর নির্ভর করতে হয়না।

জীববৈচিত্র্যনির্ভর কৃষির আবশ্যক উপাদান

ক) যাবতীয় শস্যের বীজ চাষীদের হাতে রাখা, যাতে কোন বীজ কিনতে না হয়

খ) স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর যথাযথ ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা রক্ষা করা, যাতে বাইরে থেকে কোন সার প্রয়োগের দরকার না হয়

গ) স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর যথাযথ ব্যবহার করে শত্রু পোকা বা আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা,

ঘ) শস্যের সঙ্গী উদ্ভিদকে 'আগাছা' বলে চিহ্নিত না করে তাদের যথাযথ ব্যবহার করা

ঙ) ভূ-উপরিস্থ বা বৃষ্টির পানির প্রাপ্যতা অনুযায়ী শস্য নির্বাচন করা, যাতে সেচের জন্য ভূ-গর্ভের পানি ব্যবহার করার প্রয়োজন না হয়

চ) কৃষিক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্য লালন করে তাকে যথাসম্ভব বাড়ানো

ছ) স্থানীয় জলবায়ু ও মাটির উপযোগী শস্য বীজের ব্যবহার ও সংরক্ষণের জ্ঞান এবং স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপযোগিতা বিষয়ক জ্ঞান প্রয়োগ করা ও সমৃদ্ধ করা।

নিচের সারণীতে রাসায়নিক নির্ভর কৃষি ও জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হলো:

বৈশিষ্ট্য	রাসায়নিক নির্ভর কৃষি	জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি
বীজ	ক. বাজার থেকে কিনতে হয় খ. কোন বিশেষ পুষ্টিউপাদান থাকে না গ. পুষ্টিউপাদান অনুপাতে কম থাকে ঘ. কোন বিশেষ ঔষধিগুণ থাকে না	ক. কৃষকের ঘরে থাকে খ. ফসলের বিশেষ কিছু জাতে বিভিন্ন পুষ্টিউপাদান থাকে গ. পুষ্টিউপাদান অনুপাতে বেশী থাকে ঘ. বিশেষ কিছু জাত ঔষধিগুণসম্পন্ন
সার	ক. কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ খ. বাজার থেকে কিনতে হয় গ. মাটির জীবাণু ও অন্যান্য প্রাণী (কেঁচো, ক্যারাবা কেন্নো, গুবরেপোকা, পিপড়া প্রভৃতি) মারা যায় ঘ. নাইট্রোজেন চক্র বিঘ্নিত হয়	ক. জৈব পদার্থ খ. নিজের জমিতে তৈরি করা যায় গ. মাটির জীবাণু ও অন্যান্য প্রাণী ভাল থাকে ও বৃদ্ধি পায় ঘ. নাইট্রোজেন চক্র স্বাভাবিক থাকে
কীটনাশক	ক. কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ খ. বাজার থেকে কিনতে হয় গ. সকল বন্ধু প্রাণী মারা যায় ঘ. বাতাস, মাটি ও পানিকে বিষাক্ত করে দেয় ঙ. মাটিতে বিষক্রিয়া কমপক্ষে ৬ মাস থেকে ২০ বছর থেকে যায় চ. প্রয়োগের সময় সাবধানতা না নিলে, কিডনী, লিভার, ত্বক এবং স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় ছ. খাবার ও পানীয় জলের মধ্যে বিষ থেকে যায়	ক. জৈব পদার্থ খ. অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, তাই খরচ নেই গ. সকল জীববৈচিত্র্য অটুট থাকে ঘ. বাতাস, মাটি ও পানির গুণাগুন অক্ষত থাকে ঙ. বিষক্রিয়া সর্বাধিক সাত দিন থাকে চ. জৈব কীটনাশক (যদি কখনো) প্রয়োগ করা হলে সাবধানতার প্রয়োজন নেই ছ. খাবার ও পানি নিরাপদ (বিষমুক্ত) থাকে
উদ্ভিদনাশক বা ঘাসমারা	ক. সমস্ত রকম উদ্ভিদ মারা যায় খ. ব্যায়বহুল গ. সমস্ত রকমের ব্যাঙ, ব্যাঙাচি ও জলের পোকা মারা যায় ঘ. বিষক্রিয়া ১৫ বছর পর্যন্ত বজায় থাকে	ক. সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় খ. খরচ নেই গ. সকল জীববৈচিত্র্য অটুট থাকে
যন্ত্র	ক. বাজার থেকে কিনতে হয় খ. যন্ত্র চালাবার জন্য জ্বালানী কিনতে হয় গ. জ্বালানী ব্যবহার থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়	ক. প্রয়োজন নেই খ. প্রয়োজন নেই
শ্রম	সার, কীটনাশক, উদ্ভিদনাশক ইত্যাদি প্রয়োগের জন্য বাড়তি শ্রম বা মজুরি ও সময় ব্যয় হয়	কোন বাড়তি শ্রম/ মজুরি নেই
উৎপাদন	ক. উৎপাদনশীলতা ক্রমশ কমতে থাকে খ. প্রান্তিক জমিতে (খরাপ্রবণ, জলাজমি ও সমুদ্র কূলবর্তী নোনা জমি, শুস্ক, পাবর্ত্য ঢাল জমি) উৎপাদন শূন্য বা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি	ক. উৎপাদনের হারের সমতা বছরের পর বছর বজায় থাকে খ. প্রতিটি জমির উপযোগী স্থানীয় বীজ উৎপাদনক্ষম

কৃষি প্রতিবেশগত চর্চার মাধ্যমে কৃষি কাজ করলে খামারের মাটি, পানি, বায়ু প্রভৃতি ভাল থাকে, যা জীব বৈচিত্র্য বৃদ্ধির মাধ্যমে খামারের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য সহজলভ্য করে। কৃষি প্রতিবেশকে বিদ্যমান রাখার জন্য নীতি নির্ধারক পর্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকে যেমন চাপ সৃষ্টিকারী ভূমিকা নিতে হবে, তেমনি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ নাগরিক সমাজকে কাজ করে যেতে হবে। তাহলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী আমরা রেখে যেতে পারি। আমরা এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছি।

তথ্যসূত্র

১. কৃষি ডাইরি ২০১৪, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি মন্ত্রণালয় (পৃষ্ঠা নং ৬৫)

২. FAO (2010). Trends of yield and productivity of modern rice in irrigated rice ysstems in Asia. http://www.fao.org/docrep/v6017T/V6017T03. htm.

৩. Smith, A. H. EO Lingas and M. Rahman (2000). Contamination of drinking water by arsenic in Bangladesh: a public health emergency. Bulletin of World Health Organization 78(9): 1093-1103.

৪. UNHRC (2017). Report of the Special Rapporteur on the right to food.United Nations Human Rights Council. Report No. A/HRC/34/48.

৫. Pirsaheb, M., M. Limoee, F. Namdari and R. Khamutian 2015. Organoichlorine pesticides residue in breast milk: a systematic review. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 29: 228.

৬. Aktar, M. W., D. Sengupta and A. Chowdhury (2009). Impact of pesticides use in agriculture: their benefits and hazards. Interdisciplinary Toxicology 2: 1-12.

৭. Gliessman, Stephen B. (2007). Agroecology: The ecology of sustainable food systems. CRC Press. Boca Raton/London.

৮. Altieri, M.A. 2015. Agroecology: Key Concepts, Principles and Practices. Penang: Third World Network.

৯. FAO (2015). Agroecology for Food Security and Nutrition.Proceedings of the FAO International Symposium (18-19 September 2014). Rome. http://www.fao.org/3/a-i4729e.pdf.

১০. Shiva, V., R. Holla Bhar, A. H. Jafri and K. Jalees (2002). Corporate Hijack of Agriculture. Navdanya. New Delhi.

১১. ETC Group (2008). Who Owns Nature? Communiqué Issue #100. https://www.panna.org/sites/default/files/etc_WhoOwnsNature.pdf.

সংযুক্তি-২
(২০১৮ সালে রিইব আয়োজিত লোকাল ডায়ালগ মিটিং এর কী-নোট পেপার)

আমাদের জীবন ও কৃষি

মো: ইফতেখার আলী ও সুরাইয়া বেগম

কৃষি বাংলাদেশের ঐতিহ্য এবং মূল চালিকা শক্তি। হাজার হাজার বছর ধরে এ অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজ করে আসছে। দেশের কৃষক, সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কৃষিবিদ, গবেষক এবং নীতি-নির্ধারকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের চেয়ে কৃষি উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি-তে কৃষির অবদান ক্রমে কমতে থাকলেও, এখনও দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র বিমোচনের মত বিষয়গুলোতে কৃষির ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাই কৃষি নিয়ে এবং কৃষকের সাথে রিইব এর গবেষণার অভিজ্ঞতা সকলের সাথে শেয়ার করা উচিৎ বলে আমরা মনে করি। আমাদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা কিভাবে বর্তমান পর্যায়ে আসলো, এর ফলে কৃষকরা কেমন আছেন এবং আমাদের ভবিষ্যত কৃষি কেমন হতে পারে, ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা নিচে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, অর্থাৎ ১৯৪০ এর দশক থেকে, পশ্চিমা দেশগুলো (আমেরিকা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ) এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য অঞ্চলের সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোকে 'অনুন্নত' আখ্যা দিয়ে তাদের 'উন্নয়নের' দায়িত্ব নেয়। এজন্য স্থানীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি, প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করে বিশ্বব্যাপী একই রকম একরৈখিক 'উন্নয়ন' কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। পরবর্তিতে ঐসব 'উন্নত' দেশের পরামর্শ মোতাবেক 'অনুন্নত' দেশগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে 'পশ্চিমা জীবনধারা' বা 'আমেরিকান লাইফস্টাইল' অর্জনে মনোযোগী হয়। সতেরশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু হওয়া শিল্প বিপ্লবকে পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পশ্চিমা দেশগুলো প্রয়োজনীয় পুঁজি, প্রযুক্তি, কাঁচামাল ও বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করে। পরবর্তিতে 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি'-র মাধ্যমে পুরো বিশ্ব একটা গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়। পশ্চিমা সংস্কৃতি অন্যান্য দেশের সংস্কৃতিকে আরও দ্রুত প্রভাবিত করতে শুরু করে।

এই উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায়, ১৯৬০ এর দশকে বিশ্বব্যাংক 'অনুন্নত' দেশগুলোতে সেচ প্রকল্প ও ফসল-বিজ্ঞান গবেষণায় সহায়তা ও ঋণ প্রদান বৃদ্ধি শুরু করে। এসময় কৃষি-উন্নয়ন প্যাকেজের অংশ হিসেবে, 'হাই-ইনপুট রেসপনসিভ' বা 'উচ্চ ফলনশীল' (উফসি) জাতের বীজ, সিনথেটিক সার ও কীটনাশক কৃষকের কাছে বিক্রি করা শুরু হয়। এর মাধ্যমে কৃষি সেক্টরে উত্তরের দেশগুলো থেকে পুঁজি, দক্ষতা ও প্রযুক্তি দক্ষিণের দেশগুলোতে আসা শুরু হয় এবং বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ব্যবসা শুরু করে। অধিকাংশ উফসি বীজ উৎপাদনকারী কোম্পানিই আবার রাসায়নিক উপকরণ (সার, বালাইনাশক) উৎপাদনের সাথে জড়িত। এভাবে আমেরিকা বা ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানির সাথে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষক ও ভোক্তারা যুক্ত হয়ে যায়। এসময় রকফেলার ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন ফিলিপাইনে

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ইরি- IRRI) ও মেক্সিকোতে আন্তর্জাতিক গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) প্রতিষ্ঠা করে। কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির এই ঘটনাকে 'সবুজ বিপ্লব' বলা হয়। ১৯৬৯ সালে আমেরিকান সরকার 'সবুজ বিপ্লবকে' বৈদেশিক নীতির অন্যতম উপাদান হিসেবে যুক্ত করে। দক্ষিণ এশিয়াতে সবুজ বিপ্লবের আওতায় ফিলিপাইন ও মেক্সিকো থেকে ধান ও ভূট্টার উফসি বীজ আমদানী করা হয়, যেগুলো চাষ করতে প্রয়োজন সেচযন্ত্র, ডিজেল, সার ও বালাইনাশক। এসময় দক্ষিণের সরকারগুলো কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এবং কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ভতূর্কী প্রদান শুরু করে। এই ভতূর্কী সরাসরি বিক্রেতা কোম্পানির একাউন্টে যোগ হত, যার ফলে কৃষকরা বাজার থেকে কম মূল্যে কৃষি উপকরণ কিনতে পারতেন।

উনিশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে পৃথিবীব্যাপী শিল্পায়ন ও নগরায়নের হার ক্রমে বাড়তে থাকে। মানুষের জীবন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসে চরম গতি। যন্ত্রের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে এবং পরবর্তিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসার ঘটে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর মানুষের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের উঠা-নামার সাথে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষকদের উৎপাদন খরচের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আমেরিকার পোশাকের ক্রেতারা শিশু শ্রমের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলে কাজ হারায় বাংলাদেশের গার্মেন্টেসের শিশু শ্রমিকরা। জাপান ও বাংলাদেশের শিশুরা বেড়ে উঠে একই কার্টুন দেখে।

সময়ের পরিক্রমায় এই পুঁজি-শিল্প-প্রযুক্তি নির্ভর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনায় ২০১৮ সালে এসে পৃথিবীর মোট ঋণের পরিমাণ হয়েছে ১৬৪ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার, যা পৃথিবীর মোট জিডিপির ২২৫%। এর মধ্যে শুধু আমেরিকা ও চীনের ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৭৩.৬ ট্রিলিয়ন ডলার, যা মোট ঋণের প্রায় ৪৫%। অন্যদিকে ২০১৮ সালে প্রকাশিত অক্সফামের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ১% ধনী লোক বিগত ১ বছরে উৎপাদিত মোট সম্পদের ৮২% পকেটস্থ করেছে। তাদের হিসাব মতে, বাংলাদেশের একজন গার্মেন্টস কর্মী সারা জীবনে যা আয় করে, তা পৃথিবীর ধনীতম ৫টি ফ্যাশন ব্র্যান্ডের সিইও-এর মাত্র ৪ দিনের আয়ের সমান। এছাড়া ২০১০ সাল থেকে সাধারণ কর্মীদের চেয়ে বিলিয়নারদের আয় ৬ গুন বেশি হারে বেড়েছে। আর এই বিলিওনারদের ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই পুরুষ। এভাবে চলতে থাকলে, ঐ ১% ধনী মানুষ ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশের মালিক হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিকস্ (বিবিএস) প্রকাশিত 'খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬' অনুযায়ী আমাদের দেশের সবচেয়ে ধনবান, যারা মোট পরিবারের মাত্র ৫ শতাংশ, তাদের হাতে মোট আয়ের ২৮% আছে। আর সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ পরিবারে আয় মোট আয়ের মাত্র ০.২৩%। 'ওয়েলথ এক্স'-এর ২০১৮ সালের গবেষণায় দেখা যায় যে, ২০১২- ২০১৭ এই ৫ বছরে অতি ধনী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সব ধনী দেশকে পেছনে ফেলে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সাত শতাংশ ছাড়িয়ে গেলেও, আয়বৈষম্য পরিমাপক গিনি সহগ ০.৪৮ এ পৌছে গেছে, যা ১৯৭২ সালে ছিল ০.৩২।

তবে এই অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা যে পৃথিবীর প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াচ্ছে, সেটা আঠারশ শতকের শেষভাগ থেকেই দার্শনিক, বিজ্ঞানীরা বলা শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেটা সকলের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে ১৯৯২ সালের ব্রাজিলের রিও শহরে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে। এসময় বিজ্ঞানীরা দেখান যে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ

আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। এর ফলে পৃথিবী দ্রুত গরম হয়ে যাচ্ছে, যাকে 'জলবায়ু পরিবর্তন' বলা হয়। এছাড়া পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং মরুকরণ তরান্বিত হয়েছে। তাই বিশ্বনেতারা পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী রাখার তাগিদে ৩টি চুক্তি করতে বাধ্য হয়: ১. জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন বা ইউএনএফসিসিসি, ২. জীববৈচিত্র্য কনভেশন, ও ৩. মরুকরণ রোধ কনভেনশন।

এছাড়া বিশ্বনেতারা এসব বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রতিবছর একবার মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, যা কপ (কনফারেন্স অফ দ্যা পার্টিজ) নামে পরিচিত। তবে এতকিছুর পরও পরিবেশ দূষণ, জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির হার কমানো যায়নি। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড এর ২০১৪ সালের গবেষণা অনুযায়ী গত ৪০ বছরে পৃথিবীর বন্যপ্রাণীর অর্ধেক মারা পড়েছে। গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ এর হিসাব মতে, ২০১৭ সালেও প্রতি সেকেন্ডে একটা ফুটবল মাঠের সমান বনভূমি ধ্বংস হয়েছে।

২০০৮ সালে বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন, বিগত কয়েক দশক ধরে চলা কৃষি-উন্নয়নের অগ্রগতি ও ফলাফল বোঝার জন্য একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এই IAASTD প্রতিবেদন অনুযায়ী বিগত কয়েক দশকে কৃষিবিজ্ঞানের মূল চিন্তা ছিল নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, যার ফলে কৃষি উৎপাদন কয়েক গুণ বেড়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র মানুষেরা, যারা এই উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও সবচেয়ে কম লাভবান হয়েছে, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি। বর্তমানে পৃথিবীতে একদিকে যেমন অসম উন্নয়ন হচ্ছে, অন্যদিকে দারিদ্রতা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো থেকেই যাচ্ছে। এই প্রতিবেদনে স্থানীয় ইকোসিস্টেম ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রেখে, সেই অনুযায়ী বৈচিত্র্যপূর্ণ চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন এবং পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন ও সুস্থায়ীত্বের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়। এছাড়া জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এখন পৃথিবীতে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে তা সকলের জন্য যথেষ্ট, তারপরও ৮১ কোটির বেশি মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে। অন্যদিকে উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়, যার পরিমাণ প্রায় ১.৩ বিলিয়ন টন। মোট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের শতকরা আট ভাগ এই অপচয় হওয়া খাদ্য থেকে হয়।

এছাড়া ষাটের দশকের পর থেকে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে চালু হওয়া এই রাসায়নিকনির্ভর আধুনিক কৃষির যে বিষয়গুলো সকলের চিন্তার কারণ হয়েছে সেগুলো হলঃ

ক) মাটির উর্বরতা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, ফলে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হচ্ছে;

খ) অথচ উৎপাদন ক্রমশ কমছে ;

গ) কীটনাশক বিষের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে;

ঘ) অথচ শত্রু পোকার সংখ্যা ও প্রভাব বেড়ে চলেছে;

ঙ) সেচের প্রয়োজনে ভূ-গর্ভস্থ পানি যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলেঃ

  অ) পানির স্তর ক্রমশ নিচে চলে যাচ্ছে, পানির স্টক নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে এবং সেচের খরচ বেড়ে যাচ্ছে,

  আ) অন্তত ৪২ টি জেলায় পানিতে আর্সেনিক দূষণ বেড়ে যাচ্ছে ;

চ) খাদ্য ও পানিতে এই রাসায়নিক বিষ মিশে যাচ্ছে, ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে এবং ক্যনসারের মত দুরারোগ্য ব্যাধিও বেড়ে চলেছে; এমনকি মাতৃদুগ্ধেও এই বিষ মিশে যাচ্ছে এবং শিশুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ;

ছ) চাষীর বন্ধু প্রাণীরা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, অনেক পোকা, মাছ, সরিসৃপ, ব্যাঙ, পাখি এবং মাটিতে বসবাসকারী অনেক প্রাণী ইতোমধ্যেই লোপ পেয়ে গেছে ;

জ) কৃষক বীজের জন্য বাজারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে গেছে;

ঝ) কৃষির যাবতীয় সরঞ্জাম (ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পাম্প, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক, সার প্রভৃতি) এর জন্য কৃষক বিশেষ কিছু কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে;

ঞ) এক শস্যের নিবিড় চাষের (মনোকালচার) ফলে শস্যবৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে;

ট) কৃষির যাবতীয় পরম্পরাগত জ্ঞান হারিয়ে কৃষক কৃষি পদ্ধতির জন্যও বিভিন্ন কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে;

ঠ) যন্ত্রনির্ভরতা ও বাজার নির্ভরতার ফলে ঐতিহ্যবাহী কৃষি সরঞ্জাম (লাঙল, ঢেঁকি, জাঁতা, ঘানি প্রভৃতি) এবং বলদ ও মহিষের ব্যবহার লোপ পেয়ে গেছে;

ড) কৃষি সংস্কৃতি ও স্থানীয় খাদ্য সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে;

ঢ) চাষের খরচ অনেক বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও রোজগার যথেষ্ট না হওয়ায় কৃষক কৃষিকাজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে ।

বিজ্ঞানীরা এখনও প্রকৃতিতে নতুন জীব খুঁজে পাচ্ছেন, অর্থাৎ এই জটিল জীবজগতের অনেক কিছুই আমাদের অজানা। অথচ বড় বড় কোম্পানিগুলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষ বিন্যাসে পরিবর্তন করে জিনগত পরিবর্তিত পেটেন্টেড বীজ (জিএমও) কৃষকের কাছে বিক্রি করা শুরু করা দিয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস, বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে এবং রোগ- পোকার আক্রমন বেড়ে যেতে পারে। এসব অভিঘাতের প্রেক্ষিতে 'ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার' (সিএসএ) নামে একগুচ্ছ প্রযুক্তি কৃষকদেরকে দেওয়া হচ্ছে। তবে পৃথিবীব্যপী কৃষিবিদ ও পরিবেশবিদরা এসব প্রযুক্তির কয়েকটির সমালোচনা করেছেন। তারা বলেছেন যে, এসব প্রযুক্তি কৃষকের নয় বরং ঐসব কোম্পানির জন্য লাভজনক হবে। আমরাও মনে করি যে যথাযথ গবেষণা না করে কোন প্রযুক্তিই গ্রহণ করা উচিৎ নয়।

কীটনাশকের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় ও পরিবেশবাদীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে, বিশ্বব্যাংক ১৯৯৮ সালে তাদের বালাই ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অফিসিয়াল পলিসি (নম্বর ৪.০৯) পরিবর্তন করে প্রতিবেশ-বান্ধব 'সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার' (IPM) প্রসারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ২০১৪ সাল থেকে সুস্থায়ী কৃষির (sustainable agriculture) প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিক এগ্রো-ইকোলজি সিম্পোজিয়াম আয়োজন ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তাদের মতে এগ্রো-ইকোলজি বা জীববৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল চাষাবাদ প্রচলিত কৃষির বেশি উৎপাদনশীল, জলবায়ু পরিবর্তনের আঘাত মোকাবেলায় বেশি স্থিতিস্থাপক (resilient), ফসলহানির ঝুঁকি কমায়, খাদ্যবৈচিত্র্য বাড়ায় এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করে। আবার বড় খামারের চেয়ে ছোট খামারের

উৎপাদনশীলতা বেশি এবং স্থানীয় জনগণের খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জনে সহায়ক। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে সমতা ও পরিবেশকে সর্বচ্চো গুরুত্ব দিয়ে ২০১৬- ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য 'সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমালা' (ঝউএ) গৃহিত হয়। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রগতিশীল কৃষকরা জৈব কৃষি, জিরো-বাজেট ন্যাচারাল ফার্মিং, পার্মাকালচার, এগ্রো-ইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি শুরু করেছে। বাংলাদেশ সরকারও কৃষির পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন:

ক্স ২০০২ সালে আইন করে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে;

ক্স সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (ওচগ) আওতায় সারা দেশের কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

ক্স বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের (বারি) উদ্যোগে 'বাংলাদেশ অর্গানিক এগ্রিকালচার নেটওয়ার্ক' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;

ক্স সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমালা (গউএ) পূরণে ব্যাপক সফলতার পর, সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমালা পূরণে বদ্ধপরিকর হয়েছে;

ক্স ''জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬'' প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের সাথে মোকাবেলা করতে পারে, প্রতিবেশবান্ধব ও সমতাভিত্তিক হয় এবং কৃষকের স্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য গুরুত্ব পায়। এরকম সুস্থায়ী কৃষি সম্ভব দুইভাবে: প্রথমত, ইকোলোজিকাল রেজিলেন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে; ও দ্বিতীয়ত, স্থানীয় কমিউনিটি বা সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে। এগ্রো-ইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতি এই দুইটি বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করে। এখানে শুধু ফসলের উৎপাদন প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। এর সাথে খামারে মাটি ও পরিবেশের গুণাগুণ, জীববৈচিত্র্যের উপস্থিতি, ফসলের মান, আন্ত-প্রজন্ম সমতা প্রভৃতির দিকেও নজর দেওয়া হয়। তাই এমন বীজ ব্যবহার করা হয়, যেগুলো চাষ করতে কোন কৃত্রিম উপাদানের প্রয়োজন নেই, স্থানীয় পরিবেশের সাথে মানানসই ও বীজের উপর কৃষকের অধিকার বজায় থাকে। প্রকৃতপক্ষে রাসায়নিক কৃষি শুরু হওয়ার আগের কৃষিই হচ্ছে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি। আমরা খনার বচনে, গল্প, কবিতা, গানে এই কৃষির বিভিন্ন বিষয় খুঁজে পাই। এখানে জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষ পদ্ধতি তুলে ধরা হল:

১. স্থানীয় শস্য বৈচিত্র্য বাড়িয়ে তোলা
   - ক. অন্তবর্তী শস্য চাষ (mixed cropping)
   - খ. পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শস্যের চাষ (relay cropping)
   - গ. চক্রাবর্তী চাষ ও বিভিন্ন শস্যের সঙ্গবদল (crop rotation and multiple cropping)
   - ঘ. বহুতলী মিশ্র চাষ (multi-tire cropping)
   - ঙ. শস্যের জাতের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি
২. স্থানীয় অ-শস্য সঙ্গী উদ্ভিদের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি

ক. পুষ্টি উপাদান সরবরাহ

খ. বাড়তি সঙ্গী উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ

গ. শস্যের শত্রু পোকা দমন

ঘ. শস্যের রোগ নিয়ন্ত্রণ

৩. কৃষি-ইকোসিস্টেমের অন্তর্গত প্রাণীদের প্রজাতি বৈচিত্র্য বৃদ্ধি

ক. পুষ্টি উপাদান সরবরাহ

খ. শস্যের শত্রু প্রাণী দমন

গ. শস্যের রোগ নিয়ন্ত্রণ

৪. অনুজীব বৈচিত্র্য বাড়ানো

৫. মাটি সংরক্ষণ (জাবড়া দেওয়া এবং ভূমিক্ষয় রোধকারী উদ্ভিদ লাগানো)

৬. জৈব সার, জীবাণু সার, পাতা সার ব্যবহার

৭. পানির সুষ্ঠু ব্যবহার।

রিইব কৃষক, কৃষি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও নীতি-নির্ধারকদের সাথে এগ্রো-ইকোলজির প্রসারে কাজ করছে। আমরা মনে করি সুস্থায়ী কৃষি ও শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে তোলার জন্য, কৃষি ও পরিবেশের সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে আরও বেশি আলোচনা ও বোঝাপড়া প্রয়োজন। নিজস্ব সংস্কৃতি, পরিবেশ ও ইকোসিস্টেমকে আরও ভাল করে চিনতে হবে, জানতে হবে। পরিবেশগত জ্ঞান ও সচেতনতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ জন্ম দিতে পারে একটি সুস্থায়ী সমাজের। এজন্য রিইব কর্মশালা, প্রকাশনা, আলোচনা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজন করে। তবে সুস্থায়ী কৃষির ব্যাপক প্রসারের জন্য কৃষক, ভোক্তাসহ জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে। আর এক্ষেত্রে ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাহলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ সমতাভিত্তিক বাসযোগ্য পৃথিবী আমরা রেখে যেতে পারব।

তথ্যসূত্র:

১. https://www.weforum.org/agenda/2018/09/sleepwalking-towards-the-next-financial-crisis-here-are-the-five-biggest-risks

২. https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-22/richest-1-percent-bagged-82-percent-wealth-created-last-year

৩. https://www.theguardian.com/business/2018/apr/07/global-inequality-tipping-point-2030

৪. http://samakal.com/economics/article/17101088/%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B7%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0

৫. https://www.prothomalo.com/opinion/article/1558024/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6

%98%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE

৬. https://www.theguardian.com/environment/2014/sep/29/earth-lost-50-wildlife-in-40-years-wwf

৭. https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2018/jun/27/one-football-pitch-of-forest-lost-every-second-in-2017-data-reveals

৮. https://www.greenfacts.org/en/agriculture-iaastd/

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Assessment_of_Agricultural_Knowledge,_Science_and_Technology_for_Development

৯. http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/

১০. https://www.facebook.com/unitednations/posts/10155493275340820

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/889172/?utm_source=facebook&utm_medium=social+media&utm_campaign=fao+facebook

১১. http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/FWF_and_climate_change.pdf (page 1)

১২. FAO (2010). Trends of yield and productivity of modern rice in irrigated rice ysstems in Asia. http://www.fao.org/docrep/v6017T/V6017T03. htm.

১৩. Smith, A. H. EO Lingas and M. Rahman (2000). Contamination of drinking water by arsenic in Bangladesh: a public health emergency. Bulletin of World Health Organization 78(9): 1093-1103.

১৪. UNHRC (2017). Report of the Special Rapporteur on the right to food.United Nations Human Rights Council. Report No. A/HRC/34/48.

Pirsaheb, M., M. Limoee, F. Namdari and R. Khamutian 2015. Organoichlorine pesticides residue in breast milk: a systematic review. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 29: 228.

১৫. Aktar, M. W., D. Sengupta and A. Chowdhury (2009). Impact of pesticides use in agriculture: their benefits and hazards. Interdisciplinary Toxicology 2: 1-12.

১৬. https://www.worldbank.org/en/topic/climate-smart-agriculture

১৭. Deb, D. 2009. Beyond Developmentality: Constructing Inclusive Freedom and Sustainability. Delhi: Daanish Books.

১৮. http://www.fao.org/news/story/en/item/1113475/icode/

১৯. http://www.fao.org/3/a-i4729e.pdf (Proceedings of the FAO International Symposium on Agroecology)

২০. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

২১. রিইব (২০১৭). জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল. ঢাকা: রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ ।

সংযুক্তি-৩
(২০১৭ সালে রিইব আয়োজিত কনসালটেশন মিটিং এর কী-নোট পেপার)
বাংলাদেশে এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির গুরুত্ব

সুরাইয়া বেগম

১. ভূমিকা

কৃষি হচ্ছে বাংলাদেশের অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত শক্তি। মোট শ্রম জনশক্তির ৪০% কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং জিডিপি-তে কৃষির অবদানের হার এখন ১৮.৭% (খাদ্য মন্ত্রণালয়, ২০১৩)। বর্তমানের কৃষি অনেক বেশি রাসায়নিক নির্ভর ও উৎপাদনমুখী। কৃষিতে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষিকে করেছে গতিময়। বিভিন্ন ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন, কৃষি গবেষণা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার প্রকল্প এবং কৃষকের নিরলস পরিশ্রম-প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশে কৃষির উৎপাদন ১৯৭০ এর তুলনায় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি করতে যেয়ে, বালাইনাশক. কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, রাসায়নিক সার, সেচের পানির যথেচ্ছ ব্যবহারে আজকের আধুনিক কৃষি আবার হুমকির মুখেও পড়েছে, যা নির্মল পরিবেশের জন্য সহায়ক বলা যায় না।১অন্যদিকে কৃষিতে বৃহৎ পরিসরে নব্য উদারতাবাদের ধারা বিগত তিন থেকে চার দশক ধরেই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। প্রাইভেটাইজেশনের মাধ্যমে কৃষির শিল্পায়ন এখন লাভজনক ব্যবসা মনে করা হয়। "বৈশ্বিকীকরণের" ধারণা বৃহৎ কোম্পানী দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যবসা হিসাবে কৃষির উৎপাদনকে প্রভাবিত করেছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন - এর উদ্ভব এবং মুক্ত বানিজ্য ব্যবস্থা, সরকারি ব্যয় সংকোচন নীতি, পেটেন্ট বানিজ্য ও একচ্ছত্র আধিপত্য কৃষিতে প্রকৃত কৃষকদের সংশ্লিষ্টতাকে হ্রাস করেছে, যারা কিনা যথার্থই প্রাকৃতিক সম্পদ ও বীজের মালিক।

মৌলিক প্রধান দানাশস্য ভিত্তিক খাদ্যের বৈশ্বিক চাহিদা এবং বিপুল পরিমাণে আর্ন্তজাতিক বিনিময়, হ্রাস করেছে বৈচিত্রপূর্ণ শস্য উৎপাদন সংস্কৃতি- যা কিনা এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি হিসাবে পরিচিত। এই কৃষি বৈচিত্রময় প্রতিবেশে প্রান্তিক কৃষকদের জীবিকা নির্বাহ ও টিকে থাকার উপায়। বেশি বেশি রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক প্রয়োগ ভিত্তিক একক শস্য সংস্কৃতি (monocrop culture) প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস করেছে, শুধু তাই নয় বরং উদীয়মান কর্পোরেট ফার্মের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অপারগ হয়ে তাদেরকে কৃষিতে সম্পদ বিনিয়োগ থেকে বিরত করেছে। কৃষক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে তার পেশা পরিবর্তন করছে অথবা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে শ্রমজীবি হিসাবে নিজেকে নিয়েজিত করছে।

২. বর্তমান কৃষির বিভিন্ন দিক

ষাটের দশকের পর থেকে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে চালু হওয়া এই রাসায়নিক নির্ভর আধুনিক কৃষির বেশ কিছু নেতিবাচক দিক আমাদের সামনে ধরা পড়েছে। যেমন:

১. মাটির উর্বরতা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, ফলে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হচ্ছে অথচ উৎপাদন ক্রমশ কমছে২ ।

২. কীটনাশক বিষের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে অথচ শত্রু পোকার সংখ্যা ও প্রভাব বেড়ে চলেছে ।

৩. সেচের প্রয়োজনে ভূ-গর্ভস্থ পানি যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলেপানির স্তর ক্রমশ নিচে চলে যাচ্ছে, পানির স্টক নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে, সেচের খরচ বেড়ে যাচ্ছে এবং অন্তত ৪২ টি জেলায় পানিতে আর্সেনিক দূষণ বেড়ে যাচ্ছে৩ ।

৪. খাদ্য ও পানিতে এই রাসায়নিক বিষ মিশে যাচ্ছে, ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে এবং ক্যানসারের মত দুরারোগ্য ব্যাধিও বেড়ে চলেছে; মাতৃদুগ্ধেও এই বিষ মিশে যাচ্ছে এবং শিশুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে৪ ।

৫. চাষীর বন্ধু প্রাণীরা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, অনেক পোকা, মাছ, সরিসৃপ, ব্যাঙ, পাখি এবং মাটিতে বসবাসকারী অনেক প্রাণী ইতোমধ্যেই লোপ পেয়ে গেছে৫ ।

৬. কৃষক বীজের জন্য বাজারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে গেছে ।ছ) কৃষির যাবতীয় সরঞ্জাম (ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পাম্প, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক, সার প্রভৃতি) এর জন্য কৃষক বিশেষ কিছু কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে ।

৭. একক শস্যের নিবিড় চাষের (মনোকালচার) ফলে শস্যবৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে ।

৮. কৃষির যাবতীয় পরম্পরাগত জ্ঞান হারিয়ে কৃষক কৃষি পদ্ধতির জন্যও বিভিন্ন কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে ।যন্ত্রনির্ভরতা ও বাজার নির্ভরতার ফলে ঐতিহ্যবাহী কৃষি সরঞ্জাম (লাঙল, ঢেঁকি, জাঁতা, ঘানি প্রভৃতি) এবং বলদ ও মহিষের ব্যবহার লোপ পেয়ে যাচ্ছে ।

৯. চাষের খরচ অনেক বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও রোজগার যথেষ্ট না হওয়ায় কৃষকরা কৃষিকাজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে ।

১০. কৃষি সংস্কৃতি ও স্থানীয় খাদ্য সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে ।

উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গিয়ে কৃষকরা প্রতিবেশের দিকে নজর দিচ্ছে না এবং পরিবেশবান্ধব চাষ পদ্ধতিগুলো ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে । সবাই খাদ্য শৃঙ্খলের কথা ভুলে গেছে, যেখানে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল । একজন মারা পড়লে অন্যের খাদ্যের অভাব ঘটবে; হারিয়ে যাবে প্রাণবৈচিত্র্য, পরিবেশ হবে বিপর্যস্ত । কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি যখন পানিতে মিশে তখন জলজ প্রাণীগুলো মারা যায় আর যে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায় তারাও থাকে অরক্ষিত । এছাড়া ক্রমাগত রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ ও সেচের পানির গুণাগুণ না জেনে জমিতে দেয়ার ফলে অনুজীব, কেঁচো প্রভৃতি মারা যাওয়ায় আর বিভিন্ন ধাতুর বিষক্রিয়ায় মাটি হারায় অতি মূল্যবান উর্বর শক্তি । সব মিলিয়ে আমাদের এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র নির্ভর কৃষি আজ হুমকির মুখে । তাই পৃথিবীব্যাপী কৃষিবিজ্ঞানী, পরিবেশবিজ্ঞানীরা একটি সামগ্রিক পদ্ধতি হিসাবে এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিকে মুক্তির পথ হিসেবে সুপারিশ করছেন ।৬ তাই খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও প্রতিবেশের সুরক্ষা, প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদন অব্যাহত রাখা এবং টিকে থাকার জন্যে এগ্রোইকোলজির চর্চাকে গুরুত্ব দিয়ে সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন । সেই লক্ষ্যে আমাদের আজকের এই আলোচনা ।

৩. এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির গুরুত্ব

কৃষিকাজ ও ভূমি ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে, জীব জগতের (মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও গাছপালা) সাথে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন: মাটি, পানি, বায়ু, নদী, পাহাড়, গাছ-পালা, পশু পাখী প্রভৃতি) যে পারস্পরিক সম্পর্ক সেটা নিয়ে অধ্যয়নই হচ্ছে এগ্রোইকোলজিবা জীববৈচিত্র নির্ভর কৃষি ।৭

এগ্রোইকোলজি এমন কতগুলো চর্চা বা কাজের সমষ্টি যার মাধ্যমে কৃষিকাজকে স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই ও মজবুত করে। এর লক্ষ্য হল পুষ্টিসমৃদ্ধ ও রাসায়নিকমুক্ত ফসল ফলানো। এ ধরনের কৃষিকাজ ইকোসিষ্টেমকে সুসংহত ও পুনরুদ্ধার করে এবং বাইরের উপাদান যেমনঃ রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেয়। এসব উপাদান তৈরিতে অনেক শক্তি খরচ হয়, খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার হয় এবং ক্ষতিকর গ্যাস বাতাসে ছড়ায়। এছাড়া এসব উপাদান মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অন্যদিকে এগ্রোইকোলজি হল কৃষিখামারের নিজস্ব সম্পদ এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া গাছ, পাখি, প্রাণী, পোকা এবং অনুজীব এর যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার করা, যেখানে এসবের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্ক বজায় থাকে। এই চাষ পদ্ধতি মটির উপরের ও নীচের ভূমি ও পরিবেশ উভয়ই রক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়। অতিরিক্ত বালাই, কৃষিপণ্যের উচ্চমূল্য, শস্যহানি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে এগ্রোইকোলজি ভালভাবে খাপখায়, যেখানে ভূমি, মাটি ও ফসল উৎপাদনে সহায়ক এবং বছরের পর বছর তা অব্যাহত থাকে। এগ্রোইকোলজি খাদ্যসার্বভৌমত্ব ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত মানুষের অধিকারকে প্রাধান্য দেয় যা বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক।

এগ্রোইকোলজি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে প্রান্তিক চাষীদের বিভিন্ন উপায়ে আয় করার জন্য সমাধান দেয়। এগ্রোইকোলজি শুধু পরিবেশকেই ভাল রাখেনা, সাথে সাথে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য আনয়নে অবদান রাখে। প্রান্তিক কৃষকদের জন্যে এগ্রোইকোলজি কিছু সুবিধা সৃষ্টি করে। যেমন:

ক. উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতের বৈচিত্র্য

আফ্রিকার ক্ষুদ্র চাষিরা জীববৈচিত্রনির্ভর কৃষির মাধ্যমে ৩ থেকে ১০ বছরের মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশী ফসল ফলাতে সক্ষম হয়েছে।৮মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, জলবায়ুগত পরিবর্তনে খাপ খাওয়া, স্থানীয় ও দেশীয় প্রযুক্তিচর্চা এবং বহুশস্য চাষের জন্য কৃষকরা এগ্রোইকোলজি নির্ভর চাষ করে থাকেন। স্বল্প সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকরা প্রতি একক উৎপাদনের উপর আয় করেন, সর্বোপরি কৃষকের মোট আয় বেড়ে যায়। এই চর্চা ফলনের নিশ্চয়তা দেয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

খ. খাদ্য নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ

এগ্রোইকোলজি চর্চায় দৈনন্দিন পারিবারিক খাদ্য চাহিদা পূরণ করা ছাড়াও পরবর্তী মৌসুমের জন্য খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। কৃষক খাদ্য ফলায় তার পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য এবং সে খাদ্যের জন্য বাজারের উপর কম নির্ভর করে। যে কৃষক জীববৈচিত্র নির্ভর চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে তার খাদ্য নিরাপত্তা, শস্য বৈচিত্রতা ও খাদ্য বৈচিত্রতার নিশ্চয়তা অধিকতর দেখাতে পারে তাদের থেকে, যারা প্রচলিত কৃষক। এছাড়াও এই চর্চাটি রাসায়নিক সার মুক্ত বিধায় উৎপাদিত খাদ্য স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর। ফসল সংগ্রহ থেকে রেখে দেয়া বীজ কৃষক পুনরায় চাষ করতে পারে এতে বাজারের উপর বীজের জন্য নির্ভরশীলতা কমে। যেহেতু সংগৃহিত বীজগুলো নিজেরাই নির্বাচন ও বাছাই করে তাই বাজারের বীজের

চেয়ে এ বীজের গুনাগুণ অনেক বেশী থাকে। এ বীজগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে যেহেতু এগুলো স্থানীয় আবহাওয়ায় প্রকৃতিগতভাবে উৎপাদিত।

গ. বাজার নির্ভরহীন, ঋণের চাপ কমায়

এগ্রোইকোলজি চর্চা প্রান্তিক কৃষকদের আয় সার্থকভাবে বৃদ্ধি করে। বিদ্যমান রাসায়নিক কৃষি সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য ধারণ ও বহন করে এবং বাহিরের যোগানের উপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করে। এ চাষে প্রতিটি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়। যেমনঃ মূলধন, ভূমি, পানি ও রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক। কৃষক এ খরচ মিটাতে ঋণ গ্রহন করে। অন্যদিকে, এগ্রোইকোলজি চাষ পদ্ধতিতে, বাইরের কোন ইনপুটের দরকার হয়না। উদ্ভাবনী সেচ প্রথার ব্যবহার করে এবং খামারের সম্পদ থেকে নিজেই জৈব সার (বায়ো-ইনপুট) তৈরি করে ব্যবহার করে বা অনেকক্ষেত্রে তার প্রয়োজন নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে অনেক সময় কোন মূলধন বিনিয়োগ ছাড়াই চাষ করা যায়। এমনকি যদি ফসল নষ্টও হয়ে যায়, তবুও কৃষকের ফসল চাষের জন্য কোন ঋণের বোঝা তার মাথার উপর থাকবেনা, কারণবাইরে থেকে তার কোন বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়নি। যে কোন পরিমান ফসল উৎপাদন হোক না কেন, কৃষক তা দ্বারা বেশি আয় ও সঞ্চয় করতে পারবে।

ঘ. আয়ের সুযোগ তৈরি

এগ্রোইকোলজি চর্চায় জৈব সারের জন্য পশুপালন করা হয় এবং প্রকৃতিগতভাবে উৎপাদিত সার ব্যবহার করা হয় যা সরাসরি খামার থেকে পাওয়া যায় বা বসতবাড়ির আবর্জনা থেকে তৈরি হয়। এটা সরাসরি খামারের বিনিয়োগ কমায়। কৃষক তার গচ্ছিত টাকা দিয়ে অধিক সংখ্যক পশুপাখি বা জমি ক্রয় করতে পারে বা খামারের সেচ ব্যবস্থা উন্নত করতে পারে। গরু বা গাভী এবং মুরগী পালন করে কৃষক বাড়তি আয়ের সুযোগ পায়।

ঙ. খাদ্য সার্বভৌমত্ব

খাদ্য সার্বভৌমত্ব মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করে, তারা কি খাবে এবং কি চাষ করবে এবং যা হবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে উৎপাদিত ও সকলের জন্য সহজলভ্য। স্থানীয় কৃষকের সর্বপ্রথমে স্থানীয় ও আঞ্চলিক খাদ্যে ও বাজারে প্রবেশ করার অধিকার থাকবে। তাদের উৎপাদিত ফসল বহুজাতিক কোম্পানি বা আমদানি করা পণ্যের চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার পাবে। স্থানীয় বাজারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে স্থানীয় কৃষকদের কাছে। পণ্যের মূল্য কৃষকরা নির্ধারণ করবে, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া যাবেনা। তাদের পছন্দ অনুসারে তারা কি খেতে চায় এবং কী চাষ করতে চায় এবং স্থানীয় খাবার নির্বাচনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কৃষক সম্প্রদায়েরই থাকবে। চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্য দ্বারা বিশ্বকে খাওয়াতে পারবে, কিন্তু খাদ্য সার্বভৌমত্ব খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকের সুস্বাস্থ্য, ন্যায়বিচার ও প্রাপ্য সন্মান দিতে হবে। এই পদ্ধতিতে কৃষি খামারের সামগ্রিক সম্পদ যেমন ঃ ভূমি, পানি, বীজ এবং আয়ের উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

৪. এগ্রোইকোলজি কেন বাংলাদেশের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ?

বাংলাদেশে কৃষি খাত বিভিন্ন ইস্যুতে যেমন, উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমানতা, অসহনীয় ইনপুট খরচ, প্রান্তিক কৃষকদের জন্যে স্বল্প ভতুকি, সরকারের যথাযথ ক্রয় ব্যবস্থাপনার অভাব এবং শস্য তোলার সময়ে নিম্ন মূল্য ইত্যাদি সমস্যায় আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। এক্ষেত্রে এগ্রোইকোলজি এই সমস্যা উত্তরণে সহায়ক হতে পারে। কারণ দেখা গেছে যে, এগ্রোইকোলজি বিশ্বের লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাপনের উন্নতি ঘটাতে পারে, একই সঙ্গে তাদের খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে পারে। ৯

৫. এগ্রোইকোলজি নিয়ে রিইব -এর প্রকল্পের বাস্তবায়ন

এগ্রোইকোলজি নিয়ে আরও ভালোভাবে সম্পৃক্ততার জন্যে রিইব কাজ করছে এবছরের "প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি-প্রতিবেশ: শিক্ষণ ও গণগবেষণা (২০১৭)"শীর্ষক প্রকল্পে। এগ্রোইকোলজি ভিত্তিক এই প্রকল্পে যেভাবে কাজ করা হয়েছে তার একটা সংক্ষেপ বর্ণনা জরুরী বোঝার সুবিধার্থে।

ক. পদ্ধতি

রিইব কৃষি নিয়ে কাজ করছে জন্মলগ্ন থেকেই এবং বর্তমান কাজের মূল লক্ষ্য এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র নির্ভর কৃষি সংক্রান্ত জ্ঞান অন্বেষণ এবং কৃষক জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কৃষি-প্রতিবেশ-এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে এর সাথে সম্পৃক্ত কৃষকদের জ্ঞানের বিকাশের প্রেক্ষিতে। পদ্ধতি হিসাবেগণগবেষণা বা Participatory Action Research (PAR) গ্রহণ করা হয়েছে। রিইব-এর প্রকল্পে প্রণীত গণগবেষণা পদ্ধতি একটা কার্যকরী কৃষি শিক্ষণ (pedgogy) পদ্ধতি এটা প্রমাণিত হয়েছে। রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং (আরএলএস) এর সহায়তায় রিইব গ্রামীণ কৃষকদের উদ্যোগে তাদের নিজস্ব ছোট খামারে লোকজ এবং স্থানীয় বীজ, অর্গানিক সার, কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতি এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনার চর্চা করছে এই গণগবেষণা পদ্ধতির অংশগ্রহণ হিসেবে।

খ. প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটি বাংলাদেশের চারটি ইকোলজিকাল জোন -- চট্রগ্রাম, নীলফামারী, বগুড়া এবং সাতক্ষীরা জেলায় পরিচালিত হচ্ছে।

গ. গণগবেষণা দল গঠনও দলীয় আলোচনা

প্রতিটি জেলায় ১৫ জন করে কৃষক সদস্য নিয়ে ২ টি গণগবেষণা দল গঠন করা হয়েছে। এভাবে ৪ টি জেলায় মোট ৮ টি দলের সাথে কাজ হচ্ছে। যারা কিনা প্রতি মাসে ২ টি বা তার অধিক বৈঠক করে এগ্রোইকোলজি নিয়ে আলোচনা করে। গণগবেষণা হাতে-কলমে তথা একশন ভিত্তিক হয়ে থাকে। যে কারণে প্রতিটি কৃষক দলই কোন না কোন একশনের সাথে সম্পৃক্ত। রিইব এর প্রকল্প ভিত্তিক কাজের নির্দিষ্টতায় কতগুলো কাজ করা হয়েছে। তার মধ্যে গণগবেষণা দলের বৈঠক হয়েছে ১২০ টি। যেখানে কৃষির সমস্যা, সমস্যা নিরসণে এগ্রোইকোলজির গুরুত্ব নিয়ে ধারাবহিক আলোচনা হয়েছে।

ঘ. শিক্ষণ প্রক্রিয়া :স্কুল পরিচালনা

শিক্ষণ প্রক্রিয়া হয়ে থাকে গণগবেষণার মাধ্যমে। যেখানে কৃষকেরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। এর প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে একটি 'জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল' প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রেখেছেন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ।

কৃষকের জ্ঞানকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ২ টি রেসিডেন্সিয়াল স্কুল (প্রতিটি ৩ দিন-ব্যাপী) পরিচালনা করা হয়েছে। যেখানে দেশীয় রিসোর্স পার্সনদের সহায়তায় ৩ দিন ব্যাপী কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করা হয়েছে। যার ভিত্তি ছিল জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি। এখানে বারসিক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বারি), শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞবৃন্দ তাদের সমৃদ্ধ জ্ঞানকে প্রান্তিক কৃষকদের সাথে শেয়ার করেছেন। একইভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব ব্যক্তি একক বা যৌথ উদ্যোগে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে কৃষিকাজ করে যাচ্ছেন তাদের সাথেও প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের আলোচনা হয়েছে। নেত্রোকোনার বাচ্চু মিয়া এবং রাজশাহীর ইউসুফ মোল্লার নাম এখানে উল্লেখ করতে হয়।

যেসকল কৃষক এবং সহকারী গবেষক রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরাই গ্রামে ফেরৎ গিয়ে ৮ টি লোকাল স্কুল আয়োজন করেছেন তাদের দলের এবং দলের বাইরের আগ্রহী কৃষকদের সঙ্গে লব্ধ জ্ঞান শেয়ারের উদ্দেশ্যে। একই সাথে এগ্রো-ইকোলোজি ভিত্তিক কৃষিকাজ নিরীক্ষামূলকভাবে করতে দলকে উজ্জীবিত করেছেন।

ঙ. এক্সচেঞ্জ ভিজিট

এছাড়া গণগবেষণা দলের কৃষকদের ২ টি এক্সচেঞ্জ ভিজিট আয়োজন করা হয়েছে নীলফামারী ও সাতক্ষীরাতে। যেখানে মোট ২৮ জন কৃষক ও প্রকল্প কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন। এগ্রোইকোলজি জোন ভিত্তিক এবং এলাকার বৈশিষ্ট্য ভেদে জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদ কীভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কৃষকদের সরেজমিনে দেখানোর মাধ্যমে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করা ছিল এই কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য। যা কিনা জ্ঞানের পরিসীমাকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে থাকে।

চ. ডায়ালগ

আমরা মনে করি বাংলাদেশে যেহেতু জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদ নিয়ে ব্যাপক আকারে কাজ হয়নি, তাই এ বিষয়ে সমাজের সকল স্তরের সঙ্গে ডায়ালগ করা জরুরী। কৃষি ও কৃষক সমাজ বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের পরিকল্পনায় সবসময় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। তাদের মতে, কৃষি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সেক্টর। সেজন্যে ৪ টি জেলায় ৪ টি লোকাল ডায়ালগ আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, সমাজতান্ত্রিক দল, ওয়াকার্স পার্টি, কৃষক সমিতি, ক্ষেতমজুর সমিতির প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, ইমাম, নির্বাচিতা জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী এবং কৃষকরা অংশগ্রহণ করেছেন। সেই ডায়ালগগুলোতে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে কৃষি উৎপাদনের পরিমানগত এবং গুণগত বিষয় নিয়ে। আমরা মনে করি, জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদের প্রসারে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ বিষয়ে আরও যত বেশি আলোচনা ও বিতর্ক হবে ততই বাংলাদেশের কৃষির জন্য মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসবে। আজকের কনসালটেশন মিটিং এরই একটি অনুষঙ্গ।

ছ. হাতে-কলমে এগ্রোইকোলজির প্রয়োগ করা।

বছরের শেষ পর্যায়ে এসে বলা যায় সকল কৃষকই কোন না কোনভাবে এগ্রোইকোলজিভিত্তিক কৃষি কাজ পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেছে। কেউ নিজের জমিতে অথবা অন্যের জমি কন্ট্রাক্ট নিয়ে। ৫ শতক থেকে ৩০ শতক পর্যন্ত জমিতে এই এগ্রোইকোলজি ভিত্তিক কৃষিকাজ সম্পাদিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে কৃষকেরা লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে কী করছে তা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১) বিভিন্ন শস্যের স্থানীয় জাতের বীজ সংগ্রহ ও চাষ করেছে (আমন ধানের ক্ষেত্রে নীলফামারীতে ১৮ টি, সাতক্ষীরায় ১৪ টি, বগুড়ায় ১১ টি এবং চট্টগ্রামে ১০ টি স্থানীয় ও দেশী জাত চাষ করেছে) ।

২ জিরো ইনপুট দিয়ে চাষ করেছে,

৩) জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার করেছে (বিভিন্ন ধরণের কম্পোস্ট ও ভার্মিকম্পোস্ট -দেশী ও বিদেশী কেঁচো দিয়ে- প্রভৃতি),

৪) জৈব সার দিয়ে শস্যের উফসী জাতের চাষ করেছে,

৫) শস্যক্ষেতের ইকোসিস্টেম জটিল করার জন্য জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা করেছে,

৬) মিশ্র, পর্যায়ক্রমিক ও বহুতলীয় মিশ্র চাষ করেছে,

৭) ইকোলজি রক্ষায় স্থানীয় প্রজাতির গাছ লাগানো, পরিচর্যা ও গাছে পাখির নিরাপদ আবাসের জন্য মাটির কলসি বেঁধে দিয়েছে,

৮) জৈব বালইনাশক তৈরি করেছে,

৯) গ্রামের ও শস্যক্ষেতের শস্য, অশস্য, বৃক্ষ ও প্রাণীর তালিকা ও ব্যবহার লিপিবদ্ধ করেছে,

১০) যৌথভাবে গ্রামের স্থানীয় জাতের বীজ সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে

১১) সাতক্ষীরার শ্যামনগরের ধুমঘাট গ্রামে 'কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহশালা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দলীয়ভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৬. এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদ-এর চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

প্রকল্পের কাজের মাধ্যমে মূলত: এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদ নিয়ে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সংক্ষেপে তা এখানে তুলে ধরছি।

চ্যালেঞ্জঃ

১. কৃষকের মধ্যে রাসায়নিক নির্ভর কৃষি করার অভ্যস্ততা তৈরী হয়েছে দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে, যখন থেকে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। এই কৃষকদেরকে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির বাস্তবায়নে পক্ষে আনতে সময় লেগেছে।

২. রিডিং ম্যাটেরিয়াল এর অভাব। যেহেতু বিষয়টি নতুনভাবে ফিরে এসেছে তাই সম্পৃক্ত বিষয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গবেষণামূলক লিটারেচার ব্যাপক এবং সুলভ ছিল না। এর জন্য ম্যানুয়াল তৈরি করতে হয়েছে এবং তা কৃষকদের মাঝে প্রসারিত করার প্রচেষ্টা চলছে।

৩. সময় সংক্ষিপ্ততা। প্রকল্পের বয়স ১ বছর। এত অল্প সময়ে একেবারে আনকোরা নতুন বিষয় নিয়ে কাজ করতে সময় লেগেছে এবং কৃষকরা তাদের হাজারো কাজের মাঝে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেনি। কারণ, এখন কৃষিকাজ চলে সারাবছর ধরেই, অবসর কম।

৪. এগ্রোইকোলজি করার জন্য স্থানীয় দেশীয় শস্য বীজের অপর্যাপ্ততা এবং দুস্প্রাপ্যতা। এসব বীজ সংগ্রহ করতে সময় লেগেছে অনেক।

৫. কৃষকেরা অন্যান্য কৃষকের দ্বারা হাসি-তামাশার খোরাক হয়েছে। বিভিন্ন টিটকারীমূলক কথা শুনতে হয়েছে।

৬. পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব, তথ্যের অভাব এবং লিটারেচারের অভাব। গ্রামের ঐতিহ্যবাহী কৃষি জ্ঞান হারিয়ে গেছে।

এখান থেকে উত্তরণের উপায় কি? কারণ কৃষকদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া আছে যে, বর্তমান রাসায়নিক পদ্ধতির কৃষি না করলে আমাদের উৎপাদন কমে যাবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। ভয় কৌশলে ঢুকিয়ে দিয়েছে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো। খাদ্য নিরাপত্তা কি শুধুই উৎপাদনের সাথে জড়িত নাকি এর সঙ্গে আরও বিষয় যুক্ত, তা জানতে হবে। আমরা জানি যে, আমাদের দেশের কৃষি সম্পর্কে অনেক বেশি জানে International Financial Institutions এবং তাদের সহযোগী কর্পোরেট গোষ্ঠী। তথ্যই ক্ষমতা। সেই তথ্যকে ব্যবহার করে বিদেশী সংস্থাগুলো আমাদের কৃষক সমাজকে পরোক্ষে নিয়ন্ত্রণ করে। উৎপাদনহীনতার ভয় দেখিয়ে হাইব্রীড জাতের চাষ করতে প্রলুব্ধ করে, ফলশ্রুতিতে হারিয়ে যায় আমাদের নিজস্ব বীজ।

এতসব চ্যালেঞ্জকে কৃষকদেরকে শেষ পর্যন্ত মোকাবেলা করতে হয়েছে। গণগবেষণা দ্বারা উজ্জীবিত হয়েএবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের অভিজ্ঞতায় সিক্ত হয়ে তাঁরা তা করেছেন ।

রাসায়নিক কৃষি প্রচলনের আগে পর্যন্ত যে কৃষিপদ্ধতি দশ হাজার বছর ধরে সারা পৃথিবীতে চালু ছিল সেই সাবেকী কৃষি ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি নির্ভর, জীববৈচিত্র্য নির্ভর। অর্থাৎ এই সাবেকী কৃষি পদ্ধতি কোন বিকল্প পদ্ধতি নয়, এটাই ছিল মূলধারা, যতদিন না রাসায়নিক ও যন্ত্রশিল্প ব্যবসায়িক লাভের উদ্দেশ্যে এই কৃষিকে দখল করে। আজ সমস্ত কৃষি রাসায়নিক, বীজ ও যন্ত্র কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির দখলে। জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি কোম্পানির দখল থেকে চাষীকে মুক্তি দেয়, কারণ বীজ, সার ও শত্রু পোকা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চাষীকে বাইরের কোন বস্তু বা সংস্থার উপর নির্ভর করতে হয় না।

৭. উপসংহার

যদি কৃষির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় এগ্রোইকোলজি প্রণয়ন করা যায় এখানে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন সম্ভব। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে কৃষি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সেক্টর হিসেবে বিদ্যমান।গ্রামীণ জনগণের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতিসমূহ অবশ্যই পুনর্নির্ধারণ করা উচিত এবং গ্রামীণ উন্নয়ন

কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অনুমোদন করা উচিত। নীতি নির্ধারক, সরকারী এবং বেসরকারী সম্প্রসারণ কর্মীরা একত্রিতভাবে এবং শেয়ার করে কাজ করতে হবে এবং স্থানীয় নিজস্ব লোকজ পদ্ধতি ও জ্ঞান অবলম্বন করে চাষাবাদে নতুন বিকল্প পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে। এই কর্মকান্ড বা আন্দোলন সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করার মাধ্যমে করতে হবে। যেমন নারী, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী এবং দলিত যারা অতীত কাল থেকে কৃষিকে অবলম্বন করে জীবন যাপন করছে, সময় এসেছে এই দিকে মনোযোগ দেবার।

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি চর্চার মাধ্যমে কৃষি কাজ করলে খামারের মাটি, পানি, বায়ু প্রভৃতি ভাল থাকে, যা জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধির মাধ্যমে খামারের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য সহজলভ্য করে। কৃষি প্রতিবেশকে বিদ্যমান রাখার জন্য নীতি নির্ধারক পর্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকে যেমন চাপ সৃষ্টিকারী ভূমিকা নিতে হবে, তেমনি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাসহ নাগরিক সমাজকে কাজ করে যেতে হবে। তাহলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী আমরা রেখে যেতে পারি। আমরা এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছি।

কায়ফি আজমী বলেছেন - "পরিবর্তন আনার জন্য তোমাকে ক্রমাগত কাজ করে যেতে হবে। তোমার জীবদ্দশায় হয়ত পরিবর্তন আসবে না, কিন্তু তোমাকে মন থেকে বিশ্বাস করতে হবে, পরিবর্তন সম্ভব। পরিবর্তন সবসময়ই একটা লম্বা সফর।" আমরা বিশ্বাস করি যে, পরিবর্তন সম্ভব।

* ৭ ডিসেম্বর, ২০১৭, তারিখে সিরডাপ অডিটোরিয়ামে রিইব আয়োজিত কনসালটেশন মিটিং- এ পঠিত।

তথ্যসূত্র

১. কৃষি ডাইরি ২০১৪, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি মন্ত্রণালয় (পৃষ্ঠা নং ৬৫)

২. FAO (2010). Trends of yield and productivity of modern rice in irrigated rice ysstems in Asia.http://www.fao.org/docrep/v6017T/V6017T03. htm

৩. Smith, A. H. EO Lingas and M. Rahman (2000). Contamination of drinking water by arsenic in Bangladesh: a public health emergency. Bulletin of World Health Organization 78(9): 1093-1103.

৪. Aktar, M. W., D. Sengupta and A. Chowdhury (2009). Impact of pesticides use in agriculture: their benefits and hazards. Interdisciplinary Toxicology 2: 1-12.

৫. Aktar, M. W., D. Sengupta and A. Chowdhury (2009). Impact of pesticides use in agriculture: their benefits and hazards. Interdisciplinary Toxicology 2: 1-12.

৬. Gliessman, Stephen B. (2007). Agroecology: The ecology of sustainable food systems. CRC Press.Boca Raton/London.

৭. Altieri, M.A. 2015. Agroecology: Key Concepts, Principles and Practices. Penang: Third World Network.

FAO (2015).Agroecology for Food Security and Nutrition.Proceedings of the FAO International Symposium (18-19 September 2014). Rome. http://www.fao.org/3/a-i4729e.pdf.

৮. Agroecology and the right to food", UN Special Rapporteur on the Right to Food, 2011

সংযুক্তি-৪
(২০১৮ সালে জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি বিষয়ে রিইব আয়োজিত গোলটেবিল ডায়ালগ মিটিং এর কী-নোট পেপার)
জলবায়ু পরিবর্তন ও আমাদের কৃষিঃ কৃষি প্রতিবেশ রক্ষায় পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়

সাইদুর রহমান

ভূমিকা

বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছে। রিইব ২০১২ সন থেকে কৃষি প্রশ্ন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি ব্যবহার এবং বর্তমানে 'এগ্রোইকোলজি ফ্রম বিলো' (জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি) নামে একটি কৃষি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ, মাটি-পানি-জীবন তথা জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, এবং স্থানীয় খাদ্য ব্যবস্থা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিয়ে আলোচনা-পরামর্শ ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং জ্ঞানচর্চা করা হয়। প্রকল্পের সম্প্রসারিত কর্মকাণ্ড হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি নিয়ে ২০১৭ সনের আগস্ট মাসে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়, যেখানে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞগণ জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিতে তার প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে নানান মহলের চিন্তা ও নীতি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থ, এবং কৃষি ও কৃষকের ভবিষ্যত নিয়ে সুচিন্তিত মত দেন ও তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন। উক্ত সেমিনারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে প্রাথমিকভাবে জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও জরুরী বিধায় এ বছরের জুলাই মাসে কৃষি, জলবায়ু, পানি, ভূমি, বন, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ডায়ালগের আয়োজন করা হয়। উক্ত ডায়ালগে কৃষির চিরায়ত বৈশিষ্ট্য, জলবায়ুর পরিবর্তন ও অভিযোজন, প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষায় আমাদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। একই সেমিনারের সূত্র ধরে বেসরকারি পর্যায়ে যারা কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে কাজ করছেন তাদের মধ্যে পারস্পরিক জানাশোনা বাড়ানো, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সংলাপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিচে সংক্ষেপে সংলাপের বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো।

কৃষিতে বিবর্তন ও নানাবিধ সংকট

প্রকৃতি ও মাটির জৈব শক্তি নির্ভর কৃষি বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক খাদ্যচক্র, বাস্তুসংস্থান, জীববৈচিত্র্য তথা প্রতিবেশ ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। হাজার হাজার বছর ধরে এখানকার মাটি, প্রকৃতি, পানি, জলবায়ুর সাথে তাল রেখেই বিভিন্ন উদ্ভিদ জাত তথা ফসলের উদ্ভব ঘটেছিল। আর এসব ফসল ছিল পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। বিগত কয়েক দশকে অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করতে গিয়ে কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তন

আনতে হয়। বিচিত্র ফসলের বিপরীতে উচ্চ ফলনশীল, হাইব্রিডসহ বিদেশী ফসলের জাতের প্রচলন ঘটে। মানসম্পন্ন খাদ্য শস্যের জায়গায় অর্থকরী ফসলের দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়; স্থানীয় চাহিদার পরিবর্তে কৃষিকে বাজারের চাহিদা পূরণে ব্যবহার করা হয়। কৃষি, পরিবেশ, পানি ও ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, আমরা প্রকৃতির সংরক্ষণকে পেছনে ফেলে বাণিজ্যিকীকরণ ও ভোগবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছি। ফলশ্রুতিতে, স্থানীয় জ্ঞানের পরিবর্তে ধার করা বুদ্ধির প্রভাব বেড়েছে, মনোকালচার প্রসার পেয়েছে, পানি দূষিত হয়েছে, খাদ্যের মান হ্রাস পেয়েছে, এবং স্থানীয় বীজ ও জাত কৃষকের মাঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষি, জলবায়ু, পানি ও মাটি সংক্রান্ত নীতিপদ্ধতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এসব নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার কাজে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন, জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি ও দাতাসংস্থা প্রমুখের সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়। এসব নীতিপদ্ধতি ও সংস্কারের ক্ষেত্রে বাজারমুখী লক্ষ্যগুলো, যেমন, দক্ষতা, উৎপাদন, প্রবৃদ্ধি, ভোগ ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্ব পায়। বর্তমানের কৃষি রাসায়নিক নির্ভর হওয়ার ফলে এখানকার জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়েছে, জলবায়ুর পরিবর্তন ও নাইট্রোজেন চক্রের ক্ষতি হয়েছে। আর এসবের হিসেবনিকেশ আগে থেকে করা হয়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কৃষিতে বিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বহুজাতিক কর্পোরেশন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সরকারগুলোর মাধ্যমে বাণিজ্যিক চিন্তা ও পণ্য-দ্রব্যের প্রসার ঘটাচ্ছে।

কৃষি কর্পোরেশন নির্ভর হওয়ার ফলে এটি মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্যে অনিরাপদ, মাটির বৈশিষ্ট্য ধ্বংসকারী, উপকারী পতঙ্গ ও অনুজীব ধ্বংসকারী। এর ফলে বাস্তুসংস্থান অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে, দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে, এবং অজানা সব রোগে মানুষের মৃত্যু বাড়ছে। অ্যামেরিকান জার্নাল অব ট্রপিকেল মেডিসিন প্রকাশ করেছে, শক্তিশালী কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক (এন্ডোসালফান) ২০১২ সনে বাংলাদেশের ১৩টি শিশুর মৃত্যুর কারণ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ২০১৫ সনে এই উপাদানটি নিষিদ্ধ করার পক্ষে অবস্থান নিলেও যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে যায়।

অনেকেই কৃষির সংকটের সাথে নব্য-উদারতাবাদের সম্পর্ক দেখেন, যে কারণে কৃষি ইনপুটের দাম বেশি, সরকারি বিনিয়োগ কম, বিশ্ব বাজারে অস্থিতিশীলতা, মধ্যস্বত্বভোগীর প্রভাব, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাব, রাসায়নিকের প্রভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটিক্ষয়, কীটের প্রসার, অবকাঠামোর অভাব, পল্লী অর্থনীতির মন্দা, অকৃষি খাতের প্রসার, পশুসম্পদের কমতি, ফসলের ধারাপতন, খাদ্য নিরাপত্তার অভাব ও নীতি গ্রহণে ধিরগতি দেখা যায়। বাজার, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির বিবেচনায় রাষ্ট্রের নানান খাতের কর্মীবর্গের জন্যে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, ব্যাংক-বীমা সুবিধা, রেশন ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়; অথচ, কৃষকের বেঁচে থাকার প্রশ্নেরই মীমাংসা হয় না।

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষিতে সংস্কার

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন বোঝা যাবে এখানকার গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাতের ধরন ও সময় পরিবর্তন, পানির স্তর হ্রাস, জলরাশির হ্রাস, খরা ও বন্যার মত দুর্যোগ বৃদ্ধি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নানান বিবর্তন আগেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে। দেশে দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে

যুক্ত হয় নানাবিধ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, যেগুলো অনেক সময় সুচিন্তিত ও যথাযথ হয় না; বরং সেগুলোর প্রভাবে প্রাকৃতিক ও ভূতাত্ত্বিক ক্ষতি আরও বাড়তে থাকে। কৃষিকে ক্লাইমেট স্মার্ট করতে গিয়ে দেশে দেশে বাণিজ্যিক কৃষির পক্ষে ভূমি-অধিগ্রহণ, হাইব্রিড ও জিএম শস্যের বিস্তার, ও বিষাক্ত দ্রব্যের প্রয়োগ বাড়ছে। এতে কৃষিতে বড় বড় কোম্পানির (ইয়ারা, সিনজেন্টা, মনসানটো/বেয়ার, ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতির) অনুপ্রবেশ বাড়ছে, এবং এসব কোম্পানি কৃষি ও গবেষণা অ্যালায়েন্স গড়ে তুলছে। আবার কৃষিকে জলবায়ুসহিষ্ণু করার নামে প্রাকৃতিক কৃষিপদ্ধতিগুলোকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করা হচ্ছে। ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার (সিএসএ)'র আওতায় কনজারভেশন এগ্রিকালচারের নামে প্রচুর আগাছানাশক ছড়ানো হচ্ছে; শস্যকে খরা, বন্যা, ও লবণ সহিষ্ণু করার নামে জেনেটিক্যালি মডিফাইড (জিএম) শস্য আনা হচ্ছে; পশুসম্পদের প্রসারের নামে প্রক্রিয়াকরণ, মোটাতাজাকরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থাকে মৌলিক বিবেচনা করা হচ্ছে; প্রযুক্তি বলতে বেশি বেশি যান্ত্রিকীকরণ করা হচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে কৃষিতে আনীত কেন্দ্রীভূত কোন জাদুকরী সমাধান স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায়ের জন্যে উপকারী নয়। বস্তুত, কৃষির চেয়ে বাজার ব্যবস্থার দিকে নজর রেখেই এরকম অনেক সমাধান দেওয়া হয়। এতে কৃষকের চেয়ে কর্পোরেশনগুলো কয়েকগুণ লাভ করে।

বাংলাদেশে জলবায়ুসহিষ্ণু নানান প্রযুক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, এবং জলবায়ু সহিষ্ণু কিছু জাতও উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে, এসবের মূল লক্ষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি। সেখানে মাটির স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ব্যবস্থা ইত্যাদি দিকগুলো গৌণ হয়ে পড়েছে। অন্যান্য শিল্পের সাথে সাথে বৃহদাকার সার ও কীটনাশক কোম্পানি-কারখানাগুলোও একদিকে বায়ুদূষণ, পরিবেশ দূষণ তথা জলবায়ুকে উত্তপ্ত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার নীতি-পদ্ধতি নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে প্রেসক্রিপশন-পরামর্শ দেয়।

আমরা দেখছি, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় কৃষিগবেষণা প্রতিষ্ঠান কমবেশি গ্রোথ মডেল দ্বারা প্রভাবিত, এবং তারা অনেকাংশে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কর্পোরেশনগুলোর তত্ত্ব ও নির্দেশনা মেনে চলছে। এতে, স্থানীয়জাত ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিরুদ্ধ-ব্যবস্থাই বেশি শক্তি পাচ্ছে। প্রকারান্তরে, রাসায়নিক নির্ভর জিএম, হাইব্রিড, মনোসেক্স জাতগুলো কি আমাদের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জটিল কাঠামোকে ভেঙে ফেলছে না? এগুলো কি সুস্থায়ী ও ঘাতসহ উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক?

প্রশ্ন থাকছে, কৃষিতে যত গবেষণা, কৌশল ও প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা ও অপুষ্টি কমেছে কী? কৃষিতে কৃষকের অধিকার কতটুকু বজায় থাকছে?

রিইব'এর অভিজ্ঞতা ও ডায়ালগের লক্ষ্য

রিইব উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবিমুখতা, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের সমূহ ঝুঁকি, এবং বাংলাদেশে মাটি ও প্রকৃতিতে দীর্ঘ মেয়াদী বিপর্যয়ের দিকগুলো বিবেচনা করে প্রতিবেশনির্ভর কৃষি (এগ্রোইকোলোজি) পুনরুত্থানের জন্যে কাজ করছে। রিইব মনে করে, আমরা অভিযোজনের পক্ষে যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছি সেগুলো টেকসই হতে হবে, যেখানে শস্য আবর্তন থাকবে, স্থানীয় ঐতিহ্যগত জাতের চাষ হবে, বীজের উপর কৃষকের অধিকার থাকবে ও প্রতিবেশ বাঁচবে, তথা স্থানীয় খাদ্য সার্বভৌমত্ব গড়ে উঠবে। কৃষি,

পানি, বন ও পরিবেশের ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনার সময় আমরা যেন আরো বেশি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে কথা বলতে পারি, উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনায় স্থানীয় প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় আনতে পারি, এবং আমাদের ক্ষতিসমূহ নিয়ে সমমনা সংগঠনগুলোর মধ্যে আলোচনা করতে পারি, ও বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্তি-তর্ক তুলে ধরতে পারি ।

অনেক বেসরকারি সংস্থা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি ও প্রকৃতি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন । নিজস্ব চিন্তা ও অঞ্চল ভিত্তিক প্রাকৃতিক পার্থক্যের কারণে এসব সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখিন হয় এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে । প্রকৃতি ঘনিষ্ঠ কৃষিচর্চা, তথা, জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির পথে অনেকগুলো বাধা রয়েছে; যেমন, প্রতিবেশগত ধারণা, প্রশিক্ষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়তা দান, এবং ইতিবাচক চর্চার প্রসার ঘটানো । এসব সমস্যা মোকাবেলায় যেসব সংস্থা বা গোষ্ঠী প্রাকৃতিক কৃষি বা প্রতিবেশগত কৃষি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির প্রসারে কাজ করছেন তাদের মধ্যে সমঝোতা ও ঐক্য থাকা দরকার । সমমনা সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে সংলাপের মধ্যে দিয়ে প্রতিবেশ ব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ বোঝাপড়া তৈরি হতে পারে, সংস্থার লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য সম্পদের বিনিময় হতে পারে । এ ধরনের ডায়ালগের সূত্র ধরে সংশ্লিষ্ট সংস্থা নির্দিষ্ট কোন সমস্যার সমাধানের জন্যে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি/দলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে, বিষয় ভিত্তিক কাজ চিহ্নিত করতে পারবে, সমস্যার সমাধানে জন্যে পারস্পরিক কর্ম অঞ্চল ঘুরে দেখতে পারবে, পারস্পরিক দক্ষতা বিনিময় ও বৃদ্ধি করতে পারবে, উৎপাদন, ভোক্তা, উৎপাদক ও খামার ব্যবস্থাপনার মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতে পারবেন, এবং প্রয়োজনে কৃষি ও প্রতিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একসাথে লবি/আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে ।

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে, হোটেল ইনোটেল-এ, রিইব কর্তৃক আয়োজিত "জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি" বিষয়ক ডায়ালগে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত ।

সংযুক্তি-৫
(২০১৮ সালে রিইব আয়োজিত জাতীয় সেমিনার এর কী-নোট পেপার)

প্রান্তিয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি প্রতিবেশ: শিক্ষণ ও গণগবেষণা

সুরাইয়া বেগম, নীলুফার হাই করিম, মো: ইফতেখার আলী,প্রকল্পের সহকর্মী ও কৃষক গণগবেষকবৃন্দ

ভূমিকা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গতানুগতিকতার বাইরে প্রাগ্রসর চিন্তা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। যার মধ্যে শিক্ষা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, অংশগ্রহণ, দারিদ্র দূরীকরণ (মানবিক ও আর্থিক) এবং কৃষি অন্যতম। কৃষি আমাদের দেশের ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক বলয়কে কেন্দ্র করে মানবজীবন যাপনের অন্যতম ক্ষেত্র। মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি-তে কৃষির অবদান যদিও ক্রমশ: কমছে, কিন্তু এখনও শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে কৃষি একটি বৃহৎ খাত। সর্বোপরি কৃষির সাথে দেশজ এবং বৈশ্বিক রাজনীতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। জ্ঞানতত্ত্বে কৃষি তাই যেমন গুরুত্বপূর্ণ, রিইব-এর কাজের পরিসরেও তেমনি কৃষি বিষয়ক গবেষণা অনন্য মর্যাদায় আসীন। রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর সহায়তায় দুই বছরব্যাপী বর্তমান গবেষণা প্রকল্প "প্রান্তিয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি প্রতিবেশ: শিক্ষণ ও গণগবেষণা" তাই গুরুত্ববহ।

সারা বিশ্বেই আজ বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা ও পদ্ধতি আধিপত্যশীল। এর শুরু বিগত শতাব্দীতে, যখনকিনা উন্নয়ন মতাদর্শ উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম উপায় হিসেবে প্রচারিত হতে থাকে। এরই পথ ধরে মুক্তবাজার অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করতে থাকে, সেই সাথে রাষ্টযন্ত্র ক্রমশ: শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। নাগরিক সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ যেসব ছিল যেমন গ্রামীন মেলা, কুটির শিল্পের বৈচিত্র্যময়তা, দেশজ প্রযুক্তি, সংস্কৃতিতে আত্মপরিচয়ের চেষ্টা - বিশ্ববাজারের জোয়ারএসবের ভিত্তি ক্রমশ: নড়বড়ে করে দেয় ।অন্যদিকে দেশের মানুষের চাহিদা কাঠামো বদলে যেতে থাকে গণমাধ্যম ও বহুজাতিক কর্পোরেট শক্তির আগ্রাসনের কারণে। দেখা যায় পুরো তৃতীয়বিশ্বের অর্থনীতি বিশ্ববাজারের অংশে পরিণত হয়েছে প্রায়। ফলে দেশীয় উৎপাদকেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা থেকে সরে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী একরৈখিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে নানা বৈচিত্র্যের পণ্য স্বাদ থেকে। অর্থনৈতিক বৈশ্বিকীকরণের পাশাপাশি চলছে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আগ্রাসন, যার ফলে প্রতিবাদী সংস্কৃতির ধারা মিইয়ে যাচ্ছে। মৌলবাদিতার মতাদর্শ ও সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে।

"বৈশ্বিকীকরণের" ধারণা বৃহৎ কোম্পানী দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যবসা হিসাবে কৃষির উৎপাদনকে প্রভাবিত করেছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন- এর উদ্ভব এবং মুক্তবানিজ্য ব্যবস্থা, সরকারি ব্যয় সংকোচন নীতি, পেটেন্ট বানিজ্য ও একচ্ছত্র আধিপত্য কৃষিতে প্রকৃত কৃষকদের সংশ্লিষ্টতাকে হ্রাস করেছে, যারা কিনা যথার্থই প্রাকৃতিক সম্পদ ও বীজের মালিক।

প্রধান দানাশস্য ভিত্তিক খাদ্যের বৈশ্বিক চাহিদা এবং বিপুল পরিমাণে আর্ন্তজাতিক বিনিময়, হ্রাস করেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থানীয় শস্য উৎপাদন সংস্কৃতি- যা কিনা এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি হিসাবে

পরিচিত। এই কৃষি বৈচিত্রময় প্রতিবেশে প্রান্তিক কৃষকদের জীবিকা নির্বাহ ও টিকে থাকার উপায়। রাসায়নিক সার এবং বালাইনাশক প্রয়োগ ভিত্তিক একক শস্য সংস্কৃতি (monocrop culture) প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস করেছে, শুধু তাই নয় বরং উদীয়মান কর্পোরেট ফার্মের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অপারগ হয়ে তাদেরকে কৃষিতে সম্পদ বিনিয়োগ থেকে বিরত করেছে। কৃষক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে তার পেশা পরিবর্তন করছে অথবা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে শ্রমজীবি হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত করছে।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নই প্রধান মাপকাঠি ধরা হয়েছে। এখানে আয় ও সম্পদ বণ্টনে ইকুয়িটি বা সমতার প্রশ্ন উহ্য করে রাখা হয়েছে। সে জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন প্রাধান্য পেয়েছে, যা কিনা বর্ণনা করা হয় কিছু মৌলিক চাহিদার প্রেক্ষিতে। যেখানে মূল দর্শন হলো আন্তর্জাতিক পুঁজির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের সস্তা শ্রম শোষণ করা। শ্রমের মজুরী অত্যন্ত নীচুতে রেখে কর্মসংস্থান বাড়িয়ে সেটাকেই দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে বলে প্রতিষ্ঠিত করা।

বিশ্ব পুঁজির আধিপত্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নয়ন সাহায্য দিয়ে শর্তাধীন করে রাখা হচ্ছে। এসব দেশ বেসরকারীকরণের জন্যে প্রয়োজনীয় সবরকম অর্থনৈতিক সংস্কার করার মাধ্যমে সস্তা শ্রম শোষণ করার জন্য বিদেশী পুঁজির দেশে আসার পথ প্রশস্ত করছে। যা দেশের ভিতরকার ধনী শ্রেণীকে আরও ধনী করছে এবং সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি করছে। সেই সাথে একটা ভোগবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করছে। যেখানে মানবিকতা বিপর্যস্ত হচ্ছে। সেই সাথে প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তৃত করছে।বিবিএস প্রকাশিত 'খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী দেশের মোট আয়ের ২৮% রয়েছে ৫% ধনী পরিবারের হাতে, আর সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ পরিবারের আয় মাত্র ০.২৩%।

এসবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে কিছু কর্পোরেট গোষ্ঠী, যাদের নেটওয়ার্ক সারা বিশ্বব্যাপী ছড়ানো। যাদের লক্ষ্য হলো বিশ্ববাজার দখল ও লোকজ সৃজনীশক্তি বিনষ্ট করা। এজন্য স্থানীয় সংস্কৃতি, কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি, মানুষের সাথে জীববৈচিত্র্যের সম্পর্কের মত বিষয়গুলোকে পাশ কাটিয়ে বিশ্বব্যাপী একই প্রকৃতির 'একরৈখিক' উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ এর মত সৃষ্ট আন্তর্জাতিক অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহও এর পেছনে শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এসব কিছুই করা হচ্ছে উন্নয়নের নামে, দারিদ্র্য বিমোচনের নামে, বিদেশী সাহায্যের নামে। এটা সত্য যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিদেশী সহায়তা দরকার, তবে তা অবশ্যই হতে হবে সেইসব দেশের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে, তাদের শর্তের ভিত্তিতে, কোন আরোপন, নির্ভরশীলতা সেখানে প্রযোজ্য হতে পারে না।

বর্তমান কৃষির বিভিন্ন দিক

মুক্তবাজার অর্থনীতির এই দাপট থেকে কৃষি বিযুক্ত নয় বরং আধিপত্য বিস্তারের একটা গুরুত্বপূর্ণ খাত। তাই উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায়, ১৯৬০ এর দশকে বিশ্বব্যাংক 'অনুন্নত' দেশগুলোতে সেচ প্রকল্প ও ফসল-বিজ্ঞান গবেষণায় সহায়তা ও ঋণ প্রদান বৃদ্ধি শুরু করে। এসময় কৃষি-উন্নয়ন প্যাকেজের অংশ হিসেবে, 'হাই-ইনপুট রেসপনসিভ' বা 'উচ্চ ফলনশীল' (উফসি) জাতের বীজ, সিনথেটিক সার ও কীটনাশক কৃষকের কাছে বিক্রি করা শুরু হয়। এর মাধ্যমে উত্তরের দেশগুলো থেকে পুঁজি, দক্ষতা ও প্রযুক্তি দক্ষিণের দেশগুলোতে আসা শুরু হয় এবং কৃষি সেক্টরে বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ব্যবসা শুরু করে। অধিকাংশ উফসি বীজ উৎপাদনকারী কোম্পানিই আবার রাসায়নিক উপকরণ (সার, বালাইনাশক) উৎপাদনের সাথে জড়িত। এসময় রকফেলার ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক

ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ইরি-IRRI) ও মেক্সিকোতে আন্তর্জাতিক গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) প্রতিষ্ঠা করে। কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির এই ঘটনাকে 'সবুজ বিপ্লব' বলা হয়। ১৯৬৯ সালে আমেরিকান সরকার 'সবুজ বিপ্লবকে' বৈদেশিক নীতির অন্যতম উপাদান হিসেবে যুক্ত করে।

সময়ের সাথে পথ পরিক্রমায় সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে চালু হওয়া এই রাসায়নিক নির্ভর আধুনিক কৃষির বেশ কিছু নেতিবাচক দিক আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যেমন:

১. মাটির উর্বরতা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, ফলে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হচ্ছে অথচ উৎপাদন ক্রমশ কমছে।
২. কীটনাশক বিষের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে অথচ শত্রু পোকার সংখ্যা ও প্রভাব বেড়ে চলেছে।
৩. সেচের প্রয়োজনে ভূ-গর্ভস্থ পানি যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলেপানির স্তর ক্রমশ নিচে চলে যাচ্ছে, পানির স্টক নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে, সেচের খরচ বেড়ে যাচ্ছে এবং অন্তত ৪২ টি জেলায় পানিতে আর্সেনিক দূষণ বেড়ে যাচ্ছে।
৪. খাদ্য ও পানিতে এই রাসায়নিক বিষ মিশে যাচ্ছে, ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে এবং ক্যানসারের মত দুরারোগ্য ব্যাধিও বেড়ে চলেছে; মাতৃদুগ্ধেও এই বিষ মিশে যাচ্ছে এবং শিশুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
৫. চাষীর বন্ধু প্রাণীরা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক পোকা, মাছ, সরিসৃপ, ব্যাঙ, পাখি এবং মাটিতে বসবাসকারী অনেক প্রাণী ইতোমধ্যেই লোপ পেয়ে গেছে।
৬. কৃষক বীজের জন্য বাজারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে গেছে। কৃষির যাবতীয় সরঞ্জাম (ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পাম্প, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক, সার প্রভৃতি) এর জন্য কৃষক বিশেষ কিছু কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।
৭. একক শস্যের নিবিড় চাষের (মনোকালচার) ফলে শস্যবৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে।
৮. কৃষির যাবতীয় পরম্পরাগত জ্ঞান হারিয়ে কৃষক কৃষি পদ্ধতির জন্য বিভিন্ন কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে। যন্ত্রনির্ভরতা ও বাজার নির্ভরতার ফলে ঐতিহ্যবাহী কৃষি সরঞ্জাম (লাঙল, ঢেঁকি, জাঁতা, ঘানি প্রভৃতি) এবং বলদ ও মহিষের ব্যবহার লোপ পেয়ে যাচ্ছে।
৯. চাষের খরচ অনেক বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও রোজগার যথেষ্ট না হওয়ায় কৃষকরা কৃষিকাজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে।
১০. কৃষি সংস্কৃতি ও স্থানীয় খাদ্য সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়াও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গিয়ে কৃষকরা প্রতিবেশের দিকে নজর দিচ্ছে না এবং পরিবেশবান্ধব চাষ পদ্ধতিগুলো ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সবাই খাদ্য শৃঙ্খলের কথা ভুলে গেছে, যেখানে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। একজন মারা পড়লে অন্যের খাদ্যের অভাব ঘটবে; হারিয়ে যাবে প্রাণবৈচিত্র্য, পরিবেশ হবে বিপর্যস্ত। কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি যখন পানিতে মিশে তখন জলজ প্রাণীগুলো মারা যায় আর যে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায় তারাও থাকে অরক্ষিত। এছাড়া ক্রমাগত রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ ও সেচের পানির গুণাগুণ না জেনে জমিতে দেয়ার ফলে অনুজীব, কেঁচো প্রভৃতি মারা যাওয়ায় আর বিভিন্ন ধাতুর বিষক্রিয়ায় মাটি হারায় অতি মূল্যবান উর্বর শক্তি। সব মিলিয়ে আমাদের এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র নির্ভর কৃষি আজ হুমকির মুখে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এখন পৃথিবীতে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে তা সকলের জন্য যথেষ্ট, তারপরও ৮১ কোটির বেশি মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে। অন্যদিকে উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়, যার পরিমাণ প্রায় ১.৩ বিলিয়ন টন।

২০০৮ সালে বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সহায়তায় বিগত কয়েক দশক ধরে চলা কৃষি উন্নয়নের অগ্রগতি ও ফলাফল বোঝার জন্যে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এই IAASTD প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিগত কয়েক দশকে কৃষিবিজ্ঞানের মূল চিন্তা ছিল নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, যার ফলে কৃষি উৎপাদন কয়েক গুন বেড়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র মানুষেরা, যারা এই উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও সবচেয়ে কম লাভবান হয়েছে, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি। বর্তমানে পৃথিবীতে একদিকে যেমন অসম উন্নয়ন হচ্ছে, অন্যদিকে দারিদ্র্য ও অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো থেকেই যাচ্ছে। প্রতিবেদনে স্থানীয় ইকোসিস্টেম ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রেখে সেই অনুযায়ী বৈচিত্র্যপূর্ণ চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন এবং পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন ও সুস্থায়ীত্বের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়।তাই পৃথিবীব্যাপী কৃষিবিজ্ঞানী, পরিবেশবিজ্ঞানীরা একটি সামগ্রিক পদ্ধতি হিসাবে এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিকে মুক্তির পথ হিসেবে সুপারিশ করছেন।

কর্পোরেট পুঁজিবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে যেমন তার আগ্রাসন বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে কর্পোরেট সাম্রাজ্যের ভিতর থেকেই তার বিরুদ্ধ মতবাদের শক্তি জন্ম নিচ্ছে। এই রকম প্রতিকুল পরিবেশেও মানব চেতনা এগিয়ে চলেছে। সেই কারণে রাসায়নিক নির্ভর উৎপাদনমুখী কৃষির বিপরীতে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির কথা সামনে এগিয়ে আসছে।

এতসব সমস্যার মধ্যেও নতুন ইতিবাচক শক্তিও জন্ম নেয়। যা কিনা গণতন্ত্র, মানবিক অধিকার, সামাজিক এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচারের চেতনা। পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্ব সম্মেলন হচ্ছে । ১৯৯২ সালের ব্রাজিলের রিও শহরে অনুষ্ঠিত হয় ধরিত্রী সম্মেলন। এসময় বিজ্ঞানীরা দেখান যে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। এর ফলে পৃথিবী গরম হয়ে যাচ্ছে, যাকে 'জলবায়ু পরিবর্তন' বলা হয়। এছাড়া পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং ভূমিক্ষয় ত্বরান্বিত হয়েছে। তাই বিশ্বনেতারা পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী রাখার তাগিদে ৩টি মূল্যবান চুক্তি করতে বাধ্য হয়: ১. জলবায়ু কনভেনশন বা ইউএনএফসিসিসি, ২. জীববৈচিত্র্য কনভেশন এবং ৩. ভূমিক্ষয় কনভেনশন।

পরিবেশবাদীদের আন্দোলনের প্রক্ষিতে, বিশ্বব্যাংক ১৯৯৮ সালে তাদের বালাই ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পলিসি (৪.০৯) পরিবর্তন করে প্রতিবেশ-বান্ধব 'সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার' (আইপিএম) প্রসারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক এগো-ইকোলজি সিম্পোজিয়াম আয়োজন করেছিল। তাদের মতে এগ্রো-ইকোলজি প্রচলিত কৃষির চেয়ে ৪৭-১১২% উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার প্রগতিশীল কৃষকরা জৈব কৃষি, জিরো-বাজেট ন্যাচারাল ফার্মিং, পার্মাকালচার, এগ্রো-ইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি শুরু করেছে। বাংলাদেশ সরকারও কৃষির পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় বর্তমানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন:

- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (আইপিএম) আওতায় সারা দেশের কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের (বারি) উদ্যোগে বাংলাদেশ অর্গানিক এগ্রিকালচার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে
- 'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের সাথে মোকাবেলা করতে পারে, প্রতিবেশবান্ধব হয়, কৃষকের স্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য গুরুত্ব পায় । এরকম সুস্থায়ী কৃষি সম্ভব দুভাবে:১. ইকোলজিকাল রেজিলেন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে;২. কমিউনিটি বা সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে ।

এগ্রো-ইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতি এই দুইটি বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করে । তাই রিইব কৃষক, কৃষি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও নীতি-নির্ধারকদের সাথে এগ্রো-ইকোলজির প্রসারে কাজ করছে । কারণ রিইব মনে করে খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও প্রতিবেশের সুরক্ষা, প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদন অব্যাহত রাখা এবং টিকে থাকার জন্যে এগ্রো-ইকোলজির চর্চ্চাকে গুরুত্ব দিয়ে সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন ।

এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির গুরুত্ব

কৃষিকাজ ও ভূমি ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে, জীব জগতের (মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও গাছপালা) সাথে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন: মাটি, পানি, বায়ু, নদী, পাহাড়, গাছ-পালা, পশু পাখী প্রভৃতি) যে পারস্পরিক সম্পর্ক সেটা নিয়ে অধ্যয়নই হচ্ছে এগ্রো-ইকোলজি বা জীববৈচিত্র নির্ভর কৃষি ।

এগ্রোইকোলজি এমন কতগুলো চর্চা বা কাজের সমষ্টি যার মাধ্যমে কৃষিকাজকে স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই ও মজবুত করে । এর লক্ষ্য হল পুষ্টিসমৃদ্ধ ও রাসায়নিকমুক্ত ফসল ফলানো । এ ধরনের কৃষিকাজ ইকোসিস্টেমকে সুসংহত ও পুনরুদ্ধার করে এবং বাইরের উপাদান যেমনঃ রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেয় । এসব উপাদান তৈরিতে অনেক শক্তি খরচ হয়, খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার হয় এবং ক্ষতিকর গ্যাস বাতাসে ছড়ায় । এছাড়া এসব উপাদান মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর । অন্যদিকে এগ্রোইকোলজি হল কৃষিখামারের নিজস্ব সম্পদ এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া গাছ, পাখি, প্রাণী, পোকা এবং অনুজীব এর যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার করা, যেখানে এসবের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্ক বজায় থাকে । এই চাষ পদ্ধতি মটির উপরের ও নীচের ভূমি ও পরিবেশ উভয়ই রক্ষার উপর গুরুত্ব দেয় ।

অতিরিক্ত বালাই, কৃষিপণ্যের উচ্চমূল্য, শস্যহানি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে এগ্রোইকোলজি ভালভাবে খাপখায়, যেখানে ভূমি, মাটি ও ফসল উৎপাদনে সহায়ক এবং বছরের পর বছর তা অব্যাহত থাকে । এগ্রোইকোলজি খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত মানুষের অধিকারকে প্রাধান্য দেয় যা বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক ।

এগ্রোইকোলজি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে প্রান্তিক চাষীদের বিভিন্ন উপায়ে আয় করার জন্য সমাধান দেয় । এগ্রোইকোলজি শুধু পরিবেশকেই ভাল রাখেনা, সাথে সাথে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য আনয়নে অবদান রাখে । প্রান্তিক কৃষকদের জন্যে এগ্রোইকোলজি কিছু সুবিধা সৃষ্টি করে । যেমন:

ক. উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতের বৈচিত্র্য

আফ্রিকার ক্ষুদ্রচাষিরা জীববৈচিত্রনির্ভর কৃষির মাধ্যমে ৩ থেকে ১০ বছরের মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশী ফসল ফলাতে সক্ষম হয়েছে ।মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, জলবায়ুগত পরিবর্তনে খাপ খাওয়া, স্থানীয় ও দেশীয় প্রযুক্তিচর্চা এবং বহুশস্য চাষের জন্য কৃষকরা এগ্রোইকোলজি নির্ভর চাষ করে থাকেন । স্বল্প সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকরা প্রতি একক উৎপাদনের উপর আয় করেন, সর্বোপরি কৃষকের মোট আয় বেড়ে যায় । এই চর্চা ফলনের নিশ্চয়তা দেয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে ।

খ. খাদ্য নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ

এগ্রোইকোলজি চর্চায় দৈনন্দিন পারিবারিক খাদ্য চাহিদা পূরণ করা ছাড়াও পরবর্তী মৌসুমের জন্য খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। কৃষক খাদ্য ফলায় তার পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য এবং সে খাদ্যের জন্য বাজারের উপর কম নির্ভর করে। যে কৃষক জীববৈচিত্র নির্ভর চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে তার খাদ্য নিরাপত্তা, শস্য বৈচিত্রতা ও খাদ্য বৈচিত্রতার নিশ্চয়তা অধিকতর দেখাতে পারে তাদের থেকে, যারা প্রচলিত কৃষক। এছাড়াও এই চর্চাটি রাসায়নিক সার মুক্ত বিধায় উৎপাদিত খাদ্য স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর। ফসল সংগ্রহ থেকে রেখে দেয়া বীজ কৃষক পুনরায় চাষ করতে পারে এতে বাজারের উপর বীজের জন্য নির্ভরশীলতা কমে। যেহেতু সংগৃহিত বীজগুলো নিজেরাই নির্বাচন ও বাছাই করে তাই বাজারের বীজের চেয়ে এ বীজের গুনাগুণ অনেক বেশী থাকে। এ বীজগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে যেহেতু এগুলো স্থানীয় আবহাওয়ায় প্রকৃতিগতভাবে উৎপাদিত।

গ. বাজার নির্ভরহীন, ঋণের চাপ কমায়

এগ্রোইকোলজি চর্চা প্রান্তিক কৃষকদের আয় সার্থকভাবে বৃদ্ধি করে। বিদ্যমান রাসায়নিক কৃষি সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য ধারণ ও বহন করে এবং বাহিরের যোগানের উপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করে। এ চাষে প্রতিটি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়। যেমনঃ মূলধন, ভূমি, পানি ও রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক। কৃষক এ খরচ মিটাতে ঋণ গ্রহণ করে। অন্যদিকে, এগ্রোইকোলজি চাষ পদ্ধতিতে বাইরের কোন ইনপুটের দরকার হয়না। উদ্ভাবনী সেচ প্রথার ব্যবহার করে এবং খামারের সম্পদ থেকে নিজেই জৈব সার (বায়ো-ইনপুট) তৈরি করে ব্যবহার করে বা অনেকক্ষেত্রে তার প্রয়োজন নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে অনেক সময় কোন মূলধন বিনিয়োগ ছাড়াই চাষ করা যায়। এমনকি যদি ফসল নষ্টও হয়ে যায়, তবুও কৃষকের ফসল চাষের জন্য কোন ঋণের বোঝা তার মাথার উপর থাকবেনা, কারণবাইরে থেকে তার কোন বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়নি। যে কোন পরিমান ফসল উৎপাদন হোক না কেন, কৃষক তা দ্বারা বেশি আয় ও সঞ্চয় করতে পারবে।

ঘ. আয়ের সুযোগ তৈরি

এগ্রোইকোলজি চর্চায় জৈব সারের জন্য পশুপালন করা হয় এবং প্রকৃতিগতভাবে উৎপাদিত সার ব্যবহার করা হয় যা সরাসরি খামার থেকে পাওয়া যায় বা বসতবাড়ির আবর্জনা থেকে তৈরি হয়। এটা সরাসরি খামারের বিনিয়োগ কমায়। কৃষক তার গচ্ছিত টাকা দিয়ে অধিক সংখ্যক পশুপাখি বা জমি ক্রয় করতে পারে বা খামারের সেচ ব্যবস্থা উন্নত করতে পারে। গরু বা গাভী এবং মুরগী পালন করে কৃষক বাড়তি আয়ের সুযোগ পায়।

ঙ. খাদ্য সার্বভৌমত্ব

খাদ্য সার্বভৌমত্ব মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করে, তারা কি খাবে এবং কি চাষ করবে এবং যা হবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে উৎপাদিত ও সকলের জন্য সহজলভ্য। স্থানীয় কৃষকের সর্বপ্রথমে স্থানীয় ও আঞ্চলিক খাদ্যে ও বাজারে প্রবেশ করার অধিকার থাকবে। তাদের উৎপাদিত ফসল বহুজাতিক কোম্পানি বা আমদানি করা পণ্যের চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার পাবে। স্থানীয় বাজারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে স্থানীয় কৃষকদের কাছে। পণ্যের মূল্য কৃষকরা নির্ধারণ করবে, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া যাবেনা। তাদের পছন্দ অনুসারে তারা কি খেতে চায় এবং কী চাষ করতে চায় এবং স্থানীয় খাবার নির্বাচনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার

অধিকার কৃষক সম্প্রদায়েরই থাকবে। চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্য দ্বারা বিশ্বকে খাওয়াতে পারবে। সেজন্যে খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকের সুস্বাস্থ্য, ন্যায়বিচার ও প্রাপ্য সন্মান দিতে হবে। এই পদ্ধতিতে কৃষি খামারের সামগ্রিক সম্পদ যেমন ঃ ভূমি, পানি, বীজ এবং আয়ের উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

এগ্রোইকোলজি কেন বাংলাদেশের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ?

বাংলাদেশে কৃষি খাত বিভিন্ন ইস্যুতে যেমন, উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমানতা, অসহনীয় ইনপুট খরচ, প্রান্তিক কৃষকদের জন্যে স্বল্প ভর্তুকি, সরকারের যথাযথ ক্রয় ব্যবস্থাপনার অভাব এবং শস্য তোলার সময়ে নিম্ন মূল্য ইত্যাদি সমস্যায় আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। এক্ষেত্রে এগ্রোইকোলজি এই সমস্যা উত্তরণে সহায়ক হতে পারে। কারণ দেখা গেছে যে, এগ্রোইকোলজি বিশ্বের লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাপনের উন্নতি ঘটাতে পারে, একই সঙ্গে তাদের খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে পারে।

এগ্রোইকোলজি নিয়ে রিইব-এর প্রকল্পের বাস্তবায়ন

এগ্রোইকোলজি নিয়ে আরও ভালোভাবে সম্পৃক্ততার জন্যে রিইব কাজ করছে "প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি-প্রতিবেশ: শিক্ষণ ও গণগবেষণা"শীর্ষক প্রকল্পে। এগ্রোইকোলজি ভিত্তিক এই প্রকল্পে যেভাবে কাজ করা হয়েছে তার একটা সংক্ষেপ বর্ণনা জরুরী বোঝার সুবিধার্থে।

ক. প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটি বাংলাদেশের চারটি ইকোলজিকাল জোন - চট্রগ্রামের আনোয়ারা উপজেলা, নীলফামারীর সদর উপজেলা, বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলা এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় দুটি করে গ্রামে পরিচালিত হচ্ছে।

খ. পদ্ধতি

রিইব কৃষি নিয়ে কাজ করছে জন্মলগ্ন থেকেই এবং বর্তমান কাজের মূল লক্ষ্য এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র নির্ভর কৃষি সংক্রান্ত জ্ঞান অন্বেষণ এবং কৃষক জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কৃষি-প্রতিবেশ-এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে এর সাথে সম্পৃক্ত কৃষকদের জ্ঞানের বিকাশের প্রেক্ষিতে। পদ্ধতি হিসাবে গণগবেষণা বা Participatory Action Research (PAR) গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার একটি পদ্ধতি হিসেবে গণগবেষণা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অরল্যান্ডো ফালস বোর্দা ১৯৭০-এর দশকে পার্টিসিপেটরী একশন রিসার্চ বা গণগবেষণাকে উন্নয়নশীল দেশের জন্য তাত্ত্বিকভাবে চিন্তা ও অনুশীলন করেছেন। গণগবেষণার মূল ধারণাটি হল চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে কোন শ্রেণীই কোন শ্রেণীর চাইতে 'অগ্রসর' নয়। বাস্তবে যা ঘটে তা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের কারণে কারও চিন্তা করার অবকাশ বেশী কারও কম। কেউবা বেঁচে থাকার জন্য স্থানীয় ক্ষমতাবান শ্রেণীর কাছে চিন্তা সমর্পন করেন। এরকম সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা সাধারণ মানুষের চোখে 'বুদ্ধিবৃত্তিক' শ্রেণী বলে বিবেচিত হয়। ফলে, অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে শিক্ষিতদের মত চিন্তার ক্ষমতা তাদের নেই এবং তারা শিক্ষিত শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তবে, তার মানে এই নয় যে তাদের চিন্তার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে, বরং হয়তো সেটার ধার কমেছে মাত্র।

গণগবেষণা শব্দটির পেছনে আরও একটি নাম জড়িয়ে আছে, তিনি চধঁষড় ঋৎবরৎব (রহমান ১৯৯৪) । তিনি চিন্তা করেছিলেন যে মানুষ সমাজের বাস্তবতাকে বুঝতে পারবে আনুষ্ঠানিক জ্ঞান নয়, বরং সামষ্টিক নিজস্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে, এবং এ সময়ে তারা বুঝতে পারবে নিজেদের বাস্তবতায় তাদের নিজ উদ্যোগের দ্বারা তারা নিজেরাই পরিবর্তন আনতে পারবে । এটি তাদেরকে নতুনতর উদ্যোগ নিতে উৎসাহ দেবে ।

গণগবেষণার একটি প্রধান লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মরচে ধরা চিন্তাশক্তিকে আবার শাণিত করা যাতে তারা গভীর সমাজ বিশ্লেষণে নিয়োজিত হন । যাতে তারা নিজস্ব যৌথ সমাজ বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজেদের জীবনের অবস্থার উন্নতির যৌথ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন এবং এই প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা আবার যৌথ ভাবে বিশেষণ করে নিজেদের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান উন্নত করেন এবং সেই উন্নত জ্ঞানের আলোকে আবার নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন । এককথায় শ্রমজীবিদের নিজস্ব প্রাক্সিস চালু করাই এর মূল লক্ষ্য (ফ্রেইরে ১৯৭২) ।

পাওলো ফ্রেইরি-র 'সচেতনায়ন' (কনশিয়েনটাইজেশন) প্রত্যয় শিক্ষণ প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম দিক । এই প্রত্যয় নানান দেশের তৃণমূল জনগোষ্ঠী নিয়ে যারা কাজ করেন তারা ব্যবহার করে থাকেন । এই প্রত্যয় নিপীড়িত জনগণকে তাদের জীবন পরিবর্তনের প্রচেষ্টার কান্ডারী হতে উজ্জীবিত করে । সেই সাথে চায় জনগণ সমাজ বিশ্লেষণে সমালোচনামূলক হবে এবং আত্মানুসন্ধান করবেএবং সমাজ কাঠামো বদলে উদ্যোগ নেবে । উদ্যোগ নেবে রিফ্লেকশন-একশন-রিফ্লেকশন পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্র্যাকসিস-এর মাধ্যমে । ফ্রেইরি এটি গণশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন । গণগবেষণার ক্ষেত্রেও ফ্রেইরির এই তত্ত্ব প্রভাব রেখেছে । যেখানে জনগণকে সরাসরি সমাজ গবেষণায় প্রণোদিত হতে সাহায্য করে আত্মসচেতনায়নের মাধ্যমে । রিইব-এর কাজে এর প্রতিফলন ঘটেছে কৃষকদের গণগবেষণা দল গঠন করা এবং বিভিন্ন নিজস্ব সমাজ ভাবনাগুলো অন্যদের মাঝে শেয়ার করার মাধ্যমে ।

রিইব-এর প্রকল্পে প্রণীত গণগবেষণা পদ্ধতি একটা কার্যকরী কৃষি শিক্ষণ (pedgogy) পদ্ধতি এটা প্রমাণিত হয়েছে । রিইব গ্রামীণ কৃষকদের উদ্যোগে তাদের নিজস্ব ছোট খামারে লোকজ এবং স্থানীয় বীজ, অর্গানিক সার, কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতি এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনার চর্চা করছে এই গণগবেষণা পদ্ধতির অংশগ্রহণ হিসেবে ।

গ. গণগবেষণা দল গঠনও দলীয় আলোচনা

গবেষণঅ প্রকল্পের প্রতিটি জেলায় ১৫ জন করে কৃষক সদস্য নিয়ে ২ টি গণগবেষণা দল গঠন করা হয়েছে । এভাবে ৪ টি জেলায় মোট ৮ টি দলের সাথে কাজ হচ্ছে । যারা কিনা প্রতি মাসে ২ টি বা তার অধিক বৈঠক করে এগ্রোইকোলজি নিয়ে আলোচনা করে । গণগবেষণা হাতে-কলমে তথা একশন ভিত্তিক হয়ে থাকে । যে কারণে প্রতিটি কৃষক দলই কোন না কোন একশনের সাথে সম্পৃক্ত । রিইব এর প্রকল্প ভিত্তিক কাজের নির্দিষ্টতায় কতগুলো কাজ করা হয়েছে । তার মধ্যে গণগবেষণা দলের বৈঠক হয়েছে ২৬৪টি । যেখানে কৃষির সমস্যা, সমস্যা নিরসণে এগ্রোইকোলজির গুরুত্ব নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা হয়েছে ।

ঘ. শিক্ষণ প্রক্রিয়া :স্কুল পরিচালনা

শিক্ষণ প্রক্রিয়া হয়ে থাকে গণগবেষণার মাধ্যমে । যেখানে কৃষকেরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে । এর প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে একটি 'জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি

ম্যানুয়াল' প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রেখেছেন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ।

কৃষকের জ্ঞানকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ৪টি রেসিডেন্সিয়াল স্কুল (প্রতিটি ৪দিন-ব্যাপী) পরিচালনা করা হয়েছে। রিসোর্স পার্সনদের সহায়তায় ৪দিন ব্যাপী কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করা হয়েছে। যার ভিত্তি ছিল জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি। এখানে বারসিক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বারি), শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞবৃন্দ তাদের সমৃদ্ধ জ্ঞানকে প্রান্তিক কৃষকদের সাথে শেয়ার করেছেন। একইভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব ব্যক্তি একক বা যৌথ উদ্যোগে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে কৃষিকাজ করে যাচ্ছেন তাদের সাথেও প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের আলোচনা হয়েছে।

যেসকল কৃষক এবং সহকারী গবেষক রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরাই গ্রামে ফেরৎ গিয়ে ১২টি লোকাল স্কুল আয়োজন করেছেন তাদের দলের এবং দলের বাইরের আগ্রহী কৃষকদের সঙ্গে লব্ধ জ্ঞান শেয়ারের উদ্দেশ্যে। একই সাথে এগ্রো-ইকোলোজি ভিত্তিক কৃষিকাজ নিরীক্ষামূলকভাবে করতে দলকে উজ্জীবিত করেছেন।

ঙ. এক্সচেঞ্জ ভিজিট

এছাড়া গণগবেষণা দলের কৃষকদের ২০১৭ সালে ২টি এক্সচেঞ্জ ভিজিট নীলফামারী ও সাতক্ষীরাতে এবং ২০১৮ সালে একটি ঝিনাইদহসহ সাতক্ষীরাতে আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে কৃষক ও প্রকল্প কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন। এগ্রোইকোলজি জোন ভিত্তিক এবং এলাকার বৈশিষ্ট্য ভেদে জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদ কীভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কৃষকদের সরেজমিনে দেখানোর মাধ্যমে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করা ছিল এই কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য। যা কিনা জ্ঞানের পরিসীমাকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে থাকে।

চ. ডায়ালগ

আমরা মনে করি বাংলাদেশে যেহেতু জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদ নিয়ে ব্যাপক আকারে কাজ হয়নি, তাই এ বিষয়ে সমাজের সকল স্তরের সঙ্গে ডায়ালগ করা জরুরী। কৃষি ও কৃষক সমাজ বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের পরিকল্পনায় সবসময় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। তাদের মতে, কৃষি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সেক্টর। সেজন্যে ২০১৭ সালে ৪ টি জেলায় ৪ টি এবং ২০১৮ সালে ঢাকাসহ তিনটি লোকাল ডায়ালগ আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, সমাজতান্ত্রিক দল, ওয়ার্কার্স পার্টি, কৃষক সমিতি, ক্ষেতমজুর সমিতির প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, ইমাম, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং কৃষকরা অংশগ্রহণ করেছেন। সেই ডায়ালগগুলোতে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে কৃষি উৎপাদনের পরিমানগত এবং গুণগত বিষয় নিয়ে। আমরা মনে করি, জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদের প্রসারে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের এক্সটেনশন কাজ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি নিয়ে পাবলিক এজেন্সি এবং বেসরকারি সংগঠনের সাথে ডায়ালগ করা হয়েছে।

ছ. হাতে-কলমে এগ্রোইকোলজির প্রয়োগ করা

বছরের শেষ পর্যায়ে এসে বলা যায় সকল কৃষকই কোন না কোনভাবে এগ্রোইকোলজি ভিত্তিক কৃষি কাজ পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেছে। কেউ নিজের জমিতে অথবা অন্যের জমি কন্ট্রাক্ট নিয়ে। ৫ শতক থেকে ৩০ শতক পর্যন্ত জমিতে এই এগ্রোইকোলজি ভিত্তিক কৃষিকাজ সম্পাদিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে কৃষকেরা লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে কী করছে তা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ।

১) বিভিন্ন শস্যের স্থানীয় জাতের বীজ সংগ্রহ ও চাষ করেছে (আমন ধানের ক্ষেত্রে নীলফামারীতে ১৮ টি, সাতক্ষীরায় ১৪ টি, বগুড়ায় ১১ টি এবং চট্টগ্রামে ১০ টি স্থানীয় ও দেশী জাত চাষ করেছে) ।
২) জিরো ইনপুট দিয়ে চাষ করেছে,
৩) জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার করেছে (বিভিন্ন ধরণের কম্পোস্ট ও ভার্মিকম্পোস্ট -দেশী ও বিদেশী কেঁচো দিয়ে- প্রভৃতি),
৪) জৈব সার দিয়ে শস্যের উফসী জাতের চাষ করেছে,
৫) শস্যক্ষেতের ইকোসিস্টেম জটিল করার জন্য জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা করেছে,
৬) মিশ্র, পর্যায়ক্রমিক ও বহুতলীয় মিশ্র চাষ করেছে,
৭) ইকোলজি রক্ষায় স্থানীয় প্রজাতির গাছ লাগানো, পরিচর্যা ও গাছে পাখির নিরাপদ আবাসের জন্য মাটির কলসি বেঁধে দিয়েছে,
৮) জৈব বালাইনাশক তৈরি করেছে,
৯) গ্রামের ও শস্যক্ষেতের শস্য, অশস্য, বৃক্ষ ও প্রাণীর তালিকা ও ব্যবহার লিপিবদ্ধ করেছে,
১০) যৌথভাবে গ্রামের স্থানীয় জাতের বীজ সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে
১১) সাতক্ষীরার শ্যামনগরের ধুমঘাট গ্রামে 'কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহশালা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দলীয়ভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ।

জ. নারী ও কৃষি প্রতিবেশ বিষয়ে একশন রিসার্চ

পরিবেশ হল ভূপৃষ্ঠ থেকে ওজন স্তর পর্যন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ, জীব ও জড় সবকিছুর সমষ্টি । মানবজাতির বাইরে এসবের অস্তিত্বকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নীতিগতভাবে মূল্যায়ন করা হয়না । কিন্তু প্রকৃতিতে সব কিছুরই একটা মূল্য রয়েছে । মানুষ শ্রেষ্ঠ, এই ধারণা থেকেই পরিবেশের ক্ষতি করা হচ্ছে । পরিবেশের যে একটি নিজস্ব মূল্য রয়েছে, তা নিয়ে গড়ে উঠেছে পরিবেশবাদ, যার প্রবক্তা লিওপোল্ড । । প্রকৃতির প্রতি সম্মান দেখানো হল এর ভিত্তি । মানব প্রজাতির শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসীরা মনে করে যে, পরিবেশ হচ্ছে তাদের সহায়ক বা অধস্তন সত্তা । আর সে কারণেই মানুষ প্রকৃতির প্রতি সহিংস আচরণ করে থাকে, তারা মনে করে প্রকৃতি মানুষের জন্যই সৃষ্ট । পরিবেশের প্রতিটি সত্তাই গুরুত্বপূর্ণ, তা মানবসত্তা বা যেকোন সত্তাই হোক । তাই প্রকৃতির প্রতি আমাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার ।

প্রকৃতি ও নারীকে সমান্তরালভাবে দেখা হয়ে থাকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় । সে সাথে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন নারীকে প্রকৃতি নির্ভর করে তুলেছে এবং সহজাতভাবে নারীকে পরিবেশের ব্যবস্থাপক করে দিয়েছে । মূলত নারী, পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নের ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে পরিবেশ নারীবাদ, যা পরিবেশের প্রেক্ষিতে নারী ও পুরুষকে বিবেচনা করে থাকে । পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রকৃতি ও নারীকে তাদের অধস্তন করে রেখেছে, একইভাবে নারী ও প্রকৃতিকে লাঞ্ছিত করা হয় । প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্কযেমন অসম তেমনি নারীর সাথেও পুরুষের সম্পর্ক অসম । নারীবাদীরা এ নিয়েই কাজ করেন । বর্তমান প্রকল্পে সাতক্ষীরার আদিবাসী মুন্ডা নারীরাও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল । পরিবেশ বিপর্যয় ও দূষণের ফলে প্রতিবেশ আজ বিপন্ন, যার প্রত্যক্ষ শিকার এই নারীরা । এ থেকে উত্তরণের জন্য দরকার জে-ার উপযোগী স্পেস তৈরী করা, যাতে করে নারীরা সমিতি গঠন ও অন্যান্য কর্মকা-ের মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়ে নেতৃত্ব গড়ে তুলে ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে ।

ঝ. প্রকাশনা

জ্ঞান এবং জ্ঞানের উপর মালিকানা একটি সামাজিক শক্তি। আজকে বিশ্বে আধুনিক প্রযুক্তির যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং আমাদের কৃষক সমাজ শিক্ষা ও প্রযুক্তির যে স্তরে রয়েছে তাতে জ্ঞান সম্পর্ক অনেক বেশি অসম হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে তার নানাবিধ অধিকার এবং দেশ ও বিশ্ব কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে সচেতন করাই তার উন্নয়নে সহায়তা করার প্রথম পদক্ষেপ।

রিইব জ্ঞানের এই অসমতা কমিয়ে আনা এবং কৃষকের মাঝে জ্ঞানকে পৌছে দেবার লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকাশনা বাংলায় করছে এবং সেসব প্রকাশনা নিয়ে গণগবেষণা দলের মিটিং-এ এবং লোকাল স্কুলে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞানকে প্রসারিত করছে।

এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদ-এর চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

প্রকল্পের কাজের মাধ্যমে মূলত: এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদ নিয়ে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সংক্ষেপে তা এখানে তুলে ধরছি।

চ্যালেঞ্জ

১. কৃষকের মধ্যে রাসায়নিক নির্ভর কৃষি করার অভ্যস্ততা তৈরী হয়েছে দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে, যখন থেকে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। এই কৃষকদেরকে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির বাস্তবায়নে পক্ষে আনতে সময় লেগেছে।

২. রিডিং ম্যাটেরিয়াল এর অভাব। যেহেতু বিষয়টি নতুনভাবে ফিরে এসেছে তাই সম্পৃক্ত বিষয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গবেষণামূলক লিটারেচার ব্যাপক এবং সুলভ ছিল না। এর জন্য ম্যানুয়াল তৈরি করতে হয়েছে এবং তা কৃষকদের মাঝে প্রসারিত করার প্রচেষ্টা চলছে।

৩. সময় সংক্ষিপ্ততা। প্রকল্পের বয়স ১ বছর। এত অল্প সময়ে একেবারে আনকোরা নতুন বিষয় নিয়ে কাজ করতে সময় লেগেছে এবং কৃষকরা তাদের হাজারো কাজের মাঝে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেনি। কারণ, এখন কৃষিকাজ চলে সারাবছর ধরেই, অবসর কম।

৪. এগ্রোইকোলজি করার জন্য স্থানীয় দেশীয় শস্য বীজের অপর্যাপ্ততা এবং দুস্প্রাপ্যতা। এসব বীজ সংগ্রহ করতে সময় লেগেছে অনেক।

৫. পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব, তথ্যের অভাব এবং লিটারেচারের অভাব। গ্রামের ঐতিহ্যবাহী কৃষি জ্ঞান হারিয়ে গেছে।

এতসব চ্যালেঞ্জকে কৃষকদেরকে শেষ পর্যন্ত মোকাবেলা করতে হয়েছে। গণগবেষণা দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের অভিজ্ঞতায় সিক্ত হয়ে তাঁরা তা করেছেন। এখান থেকে উত্তরণের উপায় কি? কারণ কৃষকদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া আছে যে, বর্তমান রাসায়নিক পদ্ধতির কৃষি না করলে আমাদের উৎপাদন কমে যাবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। ভয় কৌশলে ঢুকিয়ে দিয়েছে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো। খাদ্য নিরাপত্তা কি শুধুই উৎপাদনের সাথে জড়িত নাকি এর সঙ্গে আরও বিষয় যুক্ত, তা জানতে হবে। তথ্যই ক্ষমতা। সেই তথ্যকে ব্যবহার করে বিদেশী সংস্থাগুলো আমাদের কৃষক সমাজকে পরোক্ষে নিয়ন্ত্রণ করে। উৎপাদনহীনতার ভয় দেখিয়ে হাইব্রীড জাতের চাষ করতে প্রলুব্ধ করে, ফলশ্রুতিতে হারিয়ে যায় আমাদের নিজস্ব বীজ।

উপসংহার

যদি কৃষির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় এগ্রোইকোলজি প্রণয়ন করা যায় তাহলে এখানে সর্বোচ্চ অর্জন সম্ভব। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে কৃষি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সেক্টর হিসেবে বিদ্যমান। গ্রামীণ জনগণের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতিসমূহ অবশ্যই পূননির্ধারণ করা উচিত এবং গ্রামীণ উন্নয়ই কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অনুমোদন করা উচিত। নীতি নির্ধারক, সরকারি এবং বেসরকারি সম্প্রসারণ কর্মীরা একত্রিতভাবে এবং শেয়ার করে কাজ করতে হবে এবং স্থানীয় নিজস্ব লোকজ পদ্ধতি ও জ্ঞান অবলম্বন করে চাষাবাদে নতুন বিকল্প পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে। এই কর্মকান্ড বা আন্দোলন সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করার মাধ্যমে করতে হবে। যেমন নারী, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী এবং দলিত যারা অতীত কাল থেকে কৃষিকে অবলম্বন করে জীবন যাপন করছে, সময় এসেছে এই দিকে মনোযোগ দেবার।

তথ্যসূত্র

১. কৃষি ডাইরি ২০১৪, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি মন্ত্রণালয় (পৃষ্ঠা নং ৬৫)

২. FAO (2010). Trends of yield and productivity of modern rice in irrigated rice ysstems in Asia. http://www.fao.org/docrep/v6017T/V6017T03. htm

৩. Smith, A. H. EO Lingas and M. Rahman (2000). Contamination of drinking water by arsenic in Bangladesh: a public health emergency. Bulletin of World Health Organization 78(9): 1093-1103.

৪. Aktar, M. W., D. Sengupta and A. Chowdhury (2009). Impact of pesticides use in agriculture: their benefits and hazards. Interdisciplinary Toxicology 2: 1-12.

৫. Aktar, M. W., D. Sengupta and A. Chowdhury (2009). Impact of pesticides use in agriculture: their benefits and hazards. Interdisciplinary Toxicology 2: 1-12.

৬. Gliessman, Stephen B. (2007). Agroecology: The ecology of sustainable food systems. CRC Press. Boca Raton/London.

৭. Altieri, M.A. 2015. Agroecology: Key Concepts, Principles and Practices. Penang: Third World Network.

FAO (2015). Agroecology for Food Security and Nutrition.Proceedings of the FAO International Symposium (18-19 September 2014). Rome. http://www.fao.org/3/a-i4729e.pdf.

৮. Agroecology and the right to food", UN Special Rapporteur on the Right to Food, 2011

৯. http://samakal.com/economics/article/17101088/%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B7%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0

১০. https://www.facebook.com/unitednations/posts/10155493275340820
http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/889172/?utm_source=facebook&utm_medium=social+media&utm_campaign=fao+facebook

১১. https://www.greenfacts.org/en/agriculture-iaastd/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Assessment_of_Agricultural_Knowledge,_Science_and_Technology_for_Development

১২. Deb, D. 2009. Beyond Developmentality: Constructing Inclusive Freedom and Sustainability. Delhi: Daanish Books.

প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ ২০১৭- ২০১৮:

ক্রমিক	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
১.	**গণগবেষণা**	ক. প্রকল্পভুক্ত ৪টি এলাকায় (নীলফামারী সদর; সারিয়াকান্দি, বগুড়া; শ্যামনগর, সাতক্ষীরা; আনোয়ারা, চট্টগ্রাম)৮ টি গ্রামে প্রতিটিতে ১৫ জন কৃষকের মোট ৮টি গণগবেষণা দল গঠন করা হয়েছে । খ. ৪ টি এলাকায় ৪ টি (প্রতিটি ১ দিন ব্যাপি) গণগবেষণা প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে । গ. ৮ টি গণগবেষণা দলের ২৬৪টি বৈঠক (প্রতিটি দলের ৩৩ টি করে) হয়েছে ।
২.	**বেইজ লাইন ও এন্ডলাইন জরিপ**	প্রকল্পভুক্ত ৪টি জেলার ৪টি উপজেলার ৮টি গ্রামে সম্পাদিত হয়েছে । তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন আছে ।
৩.	**এক্সচেঞ্জ ভিজিট**	৩ টি (১. সাতক্ষীরা, ২. নীলফামারী ও ৩. ঝিনাইদহ ও সাতক্ষীরা)
৪.	কৃষি-প্রতিবেশগত বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদ বিষয়ে একটি ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা জন্য আবাসিক কর্মশালা	৬ দিন ব্যাপী একটি আবাসিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে এবং জীববৈচিত্র্য কৃষি বিষয়ক একটি ম্যানুয়াল প্রকাশ করা হয়েছে ।
৫.	**জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি বিষয়ে রেসিডেন্সিয়াল স্কুল**	কেন্দ্রীয়ভাবে ৪ টি রেসিডেন্সিয়াল স্কুল আয়োজন করা হয়েছে(প্রতিটি ৪ দিন ব্যাপি) যথাক্রমে নেত্রকোনা, গাজীপুর, ঢাকা ও নীলফামারীতে ।
৬.	**জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি বিষয়ে স্থানীয় স্কুল**	২০ টি স্থানীয় স্কুল আয়োজন করা হয়েছে ।
৭.	**স্থানীয় পর্যায়ে ডায়ালগ**	স্থানীয় কৃষি- প্রতিবেশগত ও কৃষিজ চ্যালেঞ্জসমূহ অনুসন্ধান ও করণীয় বিষয়ে ৭ টি ডায়ালগ মিটিং আয়োজন করা হয়েছে ।
৮.	**পরামর্শ সভা** (কনসালটেশন মিটিং)	জাতীয় পর্যায়ে ১ টি কনসালটেশন মিটিং আয়োজন করা হয়েছে ।
৯.	**নারী কৃষক বিষয়ে একশন রিসার্চ**	নীলফামারী ও সাতক্ষীরা এলাকায় নারী কৃষকরা ১ টি একশন রিসার্চে অংশগ্রহণ করছেন ।
১০.	**জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি বিষয়ে ডায়ালগ আয়োজন**	ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ে সরকারি এবং বেসরকারি ও নাগরিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে ২ টি ডায়ালগ মিটিং আয়োজন করা হয়েছে ।
১১.	**নির্বাচনী প্রার্থীদের সাথে কৃষি বিষয়ক গবেষণা**	প্রকল্পভুক্ত ৪ টি এলাকার নির্বাচনী প্রার্থীদের সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে ১ টি গবেষণা সম্পাদন করা হবে ।
১২.	**প্রকাশনা**	ক. জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি, পরিবেশ বিষয়ে ৪ টি শিক্ষামূলক প্রকাশনা বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে । খ. "জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি" বিষয়ে আয়োজিত ২ টি ডায়ালগের প্রতিবেদন বই হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে । গ. নারী কৃষকদের সাথে সম্পাদিত একশন রিসার্চ এবং নির্বাচনী প্রাথীদের সাথে সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদন বই আকারে প্রকাশ করা হবে । গ. এছাড়া সামগ্রিক প্রকল্প কার্যক্রমের উপর একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে ।
১৩.	**জাতীয় সেমিনার**	১ টি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে ।

গণগবেষক কৃষকবৃন্দের নামের তালিকা

ক্রমিক	নীলফামারী		বগুড়া	
	জয়চন্ডী	বেড়াকুঠি	নয়াপাড়া	বালুয়ার তাইর
১	আসমা বেগম	জয়ন্তী রানী	মোসা: রিনা	মোসা: শিউলি
২	হাজেরা খাতুন	বেফুলা রানী রায়	মোসা: লাভলী	কাজল রেখা
৩	উম্মে কুলসুম	কাননবালা	মোসা: শহিদা	মোসা: সালেহা
৪	ইউনুস আলী	মোজাহার আলী	মো: আনসার আলী	মোসা: রিনা খাতুন
৫	আজিজুল হক	পরিমল চন্দ্র রায়	মো: ফিরোজ	কুলসুম বেগম
৬	মজনু	অমূল্য চন্দ্র রায়	মো: ফজলু	মোসা: বিলকিস
৭	জহির উদ্দিন	হরিপদ রায়	মো: লাভলু	মো: সামসুল হক
৮	নুরুজ্জামান	রনজিৎ রায়	মো: আলমগীর	আব্দুল জলিল
৯	হাফিজ	নন্দলাল রায়	মো: হামিদুল	মো: সাজু
১০	সাইফুল ইসলাম	হরেন্দ্রনাথ রায়	মো: মজিদ	মো: বুদু প্রামানিক
১১	জাহাঙ্গীর আলম	ধীরেন রায়	মো: সানা	মো: ফুলমিয়া
১২	মতিউল আলম	পরেশ চন্দ্র রায়	মো: আলাউদ্দিন	মো: মিঠু মিয়া
১৩	লুতফর রহমান	বিমল রায়	মো: সালেক	মো: রঞ্জু মিয়া
১৪	মিজানুর রহমান	নিবারন রায়	মো: সিরাজুল ইসলাম	মো: আনোয়ারুল
১৫	মহিদুল ইসলাম	প্রিয়নাথ রায়	মো: বায়েস	মো: দিপু মিয়া

ক্রমিক	সাতক্ষীরা		চট্টগ্রাম	
	ধুমঘাট	বংশীপুর	গুন্দিপ	ঝিউড়ি
১	যাদব মুন্ডা	মো: খলিলুর রহমান	নুরুল আলম	সাধনা দত্ত
২	আশালতা	আবদুর রাজ্জাক	মো: মাহফুজ	উষ্ণা দত্ত
৩	মালতী মুন্ডা	তারক ঘোষ	মামুনুর রশিদ	অয়ন দত্ত
৪	সুমিত্রা মুন্ডা	নেপাল ঘোষ	সৈয়দ নুর	কালু দত্ত
৫	শ্যমলী মুন্ডা	গোলক অধিকারী	মো: ইসাক	মদন দত্ত
৬	রত্না মুন্ডা	রতন ঘোষ	অজি আহমেদ	রাহুল দত্ত
৭	সনাতন মুন্ডা	বিমল ঘোষ	মো: হারুন	অরুন দত্ত
৮	লখিন্দর মুন্ডা	নিমাই ঘোষ	মো: বাবু	দেবব্রত মজুমদার
৯	তপন মন্ডল	সুপদ ঘোষ	মো: লোকমান	টান্টু দত্ত
১০	ফনিন্দ্র মুন্ডা	সরজিত ঘোষ	সেকান্দর	আব্দুল মজীদ
১১	স্বপন মন্ডল	ভবতোষ ঘোষ	মো: সোহেল	খোকন দত্ত
১২	সুশান্ত মুন্ডা	সুশান্ত ঘোষ	সালাউদ্দিন	সনজীৎ দত্ত
১৩	বিশ্বকর্ম মুন্ডা	গোপাল ঘোষ	আবু তাহের	সুধীর দত্ত
১৪	মন্টু মুন্ডা	গৌর অধিকারী	আব্দুর রহমান	সাধন দত্ত
১৫	শ্রীরাম চন্দ্র মুন্ডা	মো: আবুবকর শেখ	মো: আক্তার	রিপন দত্ত

গণগবেষক প্রকল্প কর্মীদের নামের তালিকা

ক্রমিক	নাম	পদবী
১	সুরাইয়া বেগম	প্রকল্প সমন্বয়ক
২	উম্মে কুলসুম	একাউনটেন্ট
৩	নিলুফার হাই করিম	কোঅর্ডিনেটর (ডকুমেন্টেশন এন্ড ট্রেনিং)
৪	মো: ইফতেখার আলী	মাঠ সমন্বয়কারী
৫	মোজাফফর আহমেদ	গবেষণা সহকারী (চট্টগ্রাম)
৬	চৈতন্য কুমার দাস	গবেষণা সহকারী (সাতক্ষীরা)
৭	মো: আবুল ফজল	গবেষণা সহকারী (নীলফামারী)
৮	মো: আনোয়ার হোসেন	গবেষণা সহকারী (বগুড়া)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, useful, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research (*Gonogobeshona*) on the development schemes that affects them most, in order to develop ownership and generate community mobilization. For more information please visit: www.rib-bangladesh.org

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material. For more information please visit : www.rosalux.in